সাপ্তাহিক পাঠক্রম

প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পূর্ণ পবিত্রতা, সুখ এবং শান্তি প্রাপ্তির জন্য

সাপ্তাহিক পাঠক্রম

প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়

আন্তর্জাতিক মুখ্যালয়ঃ

পাণ্ডব ভবন, আবু পর্বত, রাজস্থান

পূর্বাঞ্চলীয় মুখ্যালয়ঃ

১এ, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২০

পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০১২

প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়

পরম করুণাময় ঈশ্বর শিব বিশ্বে প্রকৃত সুখ-শান্তি ও আধ্যাত্মিকতা স্থাপনে আপন সাকার মাধ্যম প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ১৯৩৭ সালে বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে ১৯৫০ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের রাজস্থান রাজ্যে পর্বতরাজ আবুতে স্থানান্তরিত হয়। সত্যযুগের রূপদান তথা সৃষ্টির নব নির্মাণ হেতু এই সংস্থার মাধ্যমে অগণিত ব্রহ্মাবৎস নব যুগের আহ্বানে সাড়া দিয়া ঈশ্বরীয় দিব্য সন্দেশ বিশ্বের সকল প্রান্তে পাঠাইবার মহান তথা যুগান্তকারী কার্য করিতেছেন।

স্বয়ং পরমাত্মার দ্বারা প্রত্যক্ষরূপে রাজযোগের শিক্ষা লাভ, পরমাত্মার অবতরণের দিব্য অনুভূতি এবং মানব মাত্রের জন্য তাঁহার সন্দেশ সকলের নিকট পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে বর্তমান বিশ্বে ১৩০টি দেশে ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৫০০ এর বেশি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এই অলৌকিক কার্যে অগণিত ব্রহ্মাকুমারী এবং ব্রহ্মাকুমারগণ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তস্বরূপ বিশ্বের সকল আত্মাকে দিব্য এবং সৌম্য রাজমার্গে নির্ভয়তার সহিত অগ্রসর হইবার প্রেরণা দান করিয়া চলিয়াছেন।

বহুকাল ধরিয়া পরমাত্মা হইতে বিমুখ হইয়া যাওয়া আত্মাগণের নৈতিক ও চারিত্রিক সংশোধনের দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্তিই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ। ফল এই সৃষ্টিতে সত্য যুগের স্থাপন।

ঈশ্বরীয় জ্ঞান, সহজ রাজযোগ, দিব্যগুণের ধারণা এবং ঈশ্বরীয় সেবা — এই সকল বিষয়ের শিক্ষার দ্বারা নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা শিব বর্তমানে নারীকে লক্ষ্মী, নরকে নারায়ণ অর্থাৎ তমঃপ্রধান মানব ও প্রকৃতিকে সতঃপ্রধান বানাইতেছেন।

দেখিবেন, আপনি যেন ইহা হইতে বঞ্চিত না হউন।

নিবেদন

স্বয়ং পরম পিতা পরমাত্মা শিব প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা যে ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও সহজ রাজযোগ শিক্ষা দান করিয়াছেন তাহা ব্রহ্মাকুমারী ভগিনী ও প্রশ্নকর্তা এক ভ্রাতা স্বপন পালের কথোপকথনের মাধ্যমে পুস্তকরূপে সংকলিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে প্রায় সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক কার্যক্রমের প্রচলন স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যেমন সপ্তাহব্যাপী রামায়ণ পাঠ, নাম-সংকীর্তন, ভজন, ভাগবত-পাঠ ইত্যাদি। পরমাত্মা শিব প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা যে জ্ঞান দান করিতেছেন তাহাও অপরকে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে কমপক্ষে এক সপ্তাহ প্রয়োজন। এইজন্য প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সপ্তাহব্যাপী ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও যোগ শিক্ষার পাঠক্রম প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই পাঠক্রম হইতে পরিপূর্ণ সফলতা লাভেচ্ছু ব্যক্তিকে এক সপ্তাহ সাত্ত্বিক আহার ও ব্রহ্মচর্য পালন, সৎসঙ্গ লাভ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষাভিলাষী ব্যক্তিকে শিক্ষা গ্রহণ করিবার পূর্বে একটি পরিচয়পত্র পূর্ণ করিতে হয়। কারণ এই পরিচয়ের সূত্রেই ঈশ্বরীয় জ্ঞান আলোচনা ও ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে।

এই পুস্তকে মানুষের দুঃখভোগের কারণ; আত্মা পরমাত্মার পরিচয়, সৃষ্টি চক্রের আবর্তন, যথা আদি-মধ্য ও অন্তের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও তিন লোক যথা ইহলোক, সূক্ষ্মলোক ও ব্রহ্মলোকের রহস্য উন্মোচিত হইয়াছে। সঙ্গমযুগে ঈশ্বরের ধরায় অবতরণ এবং সৃষ্টিচক্রের আবর্তন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির শেষে গীতা জ্ঞান দ্বারা নর নারায়ণে, নারী লক্ষ্মীতে উন্নীতকরণের প্রক্রিয়া বিবৃত হইয়াছে।

সম্পাদক

অমৃত সূচী

১) মনুষ্যাত্মার প্রকৃত পরিচয় ৭

২) তিন লোকের রহস্য ১২

৩) জন্মান্তরবাদ ১৬

৪) পরমাত্মার নিকট হইতে শান্তি ও শক্তি লাভের উপায় ২২

৫) ঈশ্বরের প্রকৃত পরিচয় ২৪

৬) পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে অপার আনন্দ লাভ ২৯

৭) পরমাত্মা কি সর্বব্যাপী ৩২

৮) পরমাত্মা দ্বারা চরিত্রের নব-নির্মাণই সৃষ্টির রচনা ৩৯

৯) সৃষ্টি-চক্রের আবর্তন ৪৩

১০) দেবত্ব লাভের উপায় ৪৫

১১) শিব ও শঙ্করের মধ্যে পার্থক্য ৪৬

১২) পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগের মাহাত্ম্য ৪৮

১৩) কল্পের আয়ু নিরূপণে ভুল গণনা ৫১

১৪) মনুষ্যাত্মার ৮৪ জন্মের বৃত্তান্ত ৫৬

১৫) মরজীবা জন্ম ৬২

১৬) ভারতবাসীর ধর্মের প্রকৃত নাম এবং ধর্মশাস্ত্রের পরিচয় ৬৩

১৭) ভারতের সর্বপ্রাচীন সহজ রাজযোগ ৭৩

১৮) সহজ রাজযোগ অভ্যাসের পদ্ধতি ৭৩

১৯) পিতাশ্রীর অমৃতময় বাণী ৮৫

প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশ্নকর্তার পরিচয় পত্র

	প্রশ্ন	উত্তর
১)	আপনার নাম, ঠিকানা ও পেশা কী?	শ্রী স্বপন পাল। বি.এ. অনার্স, ৩২, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা, চাকুরী।
২)	আপনার শারীরিক পিতার নাম, ঠিকানা ও পেশা কী?	শ্রী গোপীনাথ পাল। ৩২, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা। ব্যবসা।
৩)	পরমপিতা পরমাত্মার দিব্য নাম, দিব্যধাম, দিব্য কর্তব্য এবং বিশেষ দিব্য গুণ কী?	তাঁহার নাম-রূপ নাই। তিনি সর্বব্যাপী। তিনি শান্তির সাগর, সর্বশক্তিমান। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, ও সংহারকর্তা।
৪)	আপনার ধর্মের নাম কী এবং ঐ ধর্ম কে স্থাপন করিয়াছেন?	আমার ধর্ম হিন্দু। এই ধর্ম কে স্থাপন করিয়াছেন আমি তাহা জানি না।
৫)	আপনি পরমপিতা পরম আত্মাকে কেন স্মরণ করেন?	তাঁহার নিকট হইতে শান্তি পাইবার জন্য তাঁহাকে স্মরণ করি।

প্রশ্ন	উত্তর
৬) গীতার ভগবান কে?	গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।
৭) আপনার কোন গুরু বা পথপ্রদর্শক আছে কি?	না, আমার কোন গুরু নাই।
৮) এখানে কী উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন?	পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া প্রকৃত শান্তি লাভ করিবার জন্য।

শ্রী স্বপন পাল

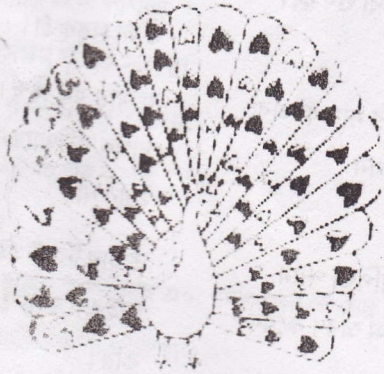

ঈশ্বরীয় জ্ঞানের

সাপ্তাহিক পাঠক্রম

প্রথম দিন

পাঠ - ১

মনুষ্যাত্মার প্রকৃত পরিচয়

ব্রহ্মাকুমারী — আপনার নাম কী?

প্রশ্নকর্তা — আমার নাম স্বপন।

ব্রহ্মাকুমারী — কিন্তু, আপনার নাম তো তাহা নহে!

প্রশ্নকর্তা — দিদি, আমার নাম স্বপন-ই।

ব্রহ্মাকুমারী — উহা আপনার শরীরের নাম। আপনি শরীর নন, আপনি এক অবিনাশী আত্মা। যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয়, 'আপনি কে'? সে বলে আমি ডাক্তার, কেহ বলে ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি। কিন্তু তাহারা এই কথা ভাবেন না যে এই সব শরীর ধারণ করিবার পর পেশা বা কর্ম অনুযায়ী পরিচয় জ্ঞাপক সম্ভাষণ (Professional names)। আমরা প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত পরিচয় জ্ঞাপক নাম হইতে পৃথক। কারণ যখন আমরা ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়ী অথবা ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি পেশায় ছিলাম না, অর্থাৎ যখন আমাদের শরীর বাল্য অবস্থায় ছিল, তখনও আমরা বিদ্যমান ছিলাম। আবার যখন আমরা বৃদ্ধ হইয়া যাইব তখনও আমরা বিদ্যমান থাকিব। অতএব ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে তাহারা এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতেছে না। যে শরীর রূপ আধার লইয়া বিভিন্ন পেশা, ব্যবসা ইত্যাদিতে রত সেই 'আমি' কে? প্রকৃতপক্ষে 'আমি' এবং 'আমার' এই দুটি-ই পৃথক সত্তা। 'আমি' মানে আত্মা, আর 'আমার' শরীর উহার নিবাস স্থান। ধরুন আপনি বলিবেন 'আমি ঘর'। এইভাবে আপনি

শরীর নন, শরীর আপনার ঘর—আপনার নিবাস স্থল। যেমন, কোন ড্রাইভার মোটর গাড়ির ভিতরে বসিয়া আছে এবং উহা চালনা করিতেছে, কিন্তু সে উহা হইতে পৃথক। সেইরূপ আত্মা 'ড্রাইভার' বা রথী। আর এই শরীর উহার রথ। আত্মাই কান দ্বারা শ্রবণ করে, মুখ দ্বারা কথা বলে এবং চোখ দ্বারা দর্শন করে। তাহা হইলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনি আত্মা না শরীর! শরীর বা কর্মেন্দ্রিয় আপনার কর্ম সম্পাদন করিবার অবলম্বন মাত্র।

আমি কে?

ইহা সর্বজনবিদিত যে এই শরীর পাঁচ তত্ত্বের পুতুল এবং যন্ত্র বিশেষ, ইহার দ্বারা আমরা কথা বলি, দেখি, শুনি এবং চলাফেরা করি। আমরা এই শরীর হইতে পৃথক সত্ত্বা এবং শরীরের পরিচালক। যেমন টেলিফোনে বার্তালাপকারী ব্যক্তি টেলিফোন যন্ত্র হইতে পৃথক এক বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন সংবেদনশীল চেতন সত্ত্বা; সেই রূপ আমরাও হাড়-মাংসের পিঁজরায় গঠিত। চোখ, মুখ, নাক, কান ইত্যাদি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক চৈতন্য সত্ত্বা। আত্মার শরীর ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া অর্থাৎ উহার মধ্যে যে মূল্যবান চৈতন্য বিরাজমান সত্ত্বা (আত্মা) ছিল তাহা বাহির হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই শরীরের আর প্রয়োজন কী? লোকে বলে—"ইহার মধ্য হইতে জ্যোতি চলিয়া গিয়াছে, প্রচলিত কথায় প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে, খেলা শেষ হইয়া গিয়াছে" ইত্যাদি।

আত্মা কী এবং মন, বুদ্ধি ও সংস্কার কী?

আত্মা এক চৈতন্য শক্তি বা সত্ত্বা। আত্মাকে চৈতন্য-শক্তি বা সত্ত্বা এই জন্য বলা হয় যে উহা চিন্তা ও বিচার করিতে, সুখ-দুঃখ আনন্দ বেদনা ও শান্তির অনুভব করিতে পারে; উহা ভাল বা মন্দ কর্ম করিতেও সক্ষম। অতএব আত্মা মন, বুদ্ধি ও সংস্কার হইতে পৃথক নহে। আত্মার সঙ্কল্প শক্তিকে সুখ দুঃখের অনুভবকারী সত্ত্বাকে, তাহার ইচ্ছা বা কামনাকে 'মন' বলে। আত্মার নির্ণয়কারী শক্তি, বিচার বা

বিবেক শক্তিকে 'বুদ্ধি' বলে। আত্মা দ্বারা অনুষ্ঠিত সৎ-অসৎ কর্মের যে প্রভাব আত্মার উপর পড়ে তাহাকে আত্মার 'সংস্কার' বলে। ইহাও বলা যাইতে পারে যে ভাল বা মন্দ কর্মের দ্বারা আত্মার যে প্রবৃত্তি গড়িয়া ওঠে তাহাই উহার সংস্কার বা স্বভাব (স্ব+ভাব)।

অতএব আত্মাকে মন, বুদ্ধি এবং সংস্কার হইতে পৃথক ভাবার অর্থ আত্মাকে জড় বলিয়া গণ্য করা। আত্মা এবং প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য এই যে প্রকৃতির ইচ্ছা, বিচার, প্রয়াস এবং অনুভব ইত্যাদি লক্ষণ থাকে না, কিন্তু আত্মার মধ্যে এইসব লক্ষণ বিদ্যমান। যে আত্মার ইচ্ছা, প্রয়াস এবং অনুভব-শুদ্ধ এবং সাত্ত্বিক তাহাকে মহাত্মা, পুণ্যাত্মা অথবা পবিত্র আত্মা বলে। আর যাহার মধ্যে উহা অশুদ্ধ অথবা তামসিক; তাহাকে পাপাত্মা অথবা পতিত আত্মা বলে। আত্মার এই ভাল বা মন্দ হওয়ার জন্য বলা হয় 'আত্মা নিজেই নিজের শত্রু, আবার নিজেই নিজের মিত্র'।

সুতরাং আজ মানুষ মনকে আত্মা হইতে পৃথক বিবেচনা করিয়া মনের উপর যে দোষারোপ করিতেছে .... 'মন বড় চঞ্চল, নীচ, পাপী, উহাকে বশে আনা যায় না,' ইহার অর্থ তাহারা নিজেদের নির্দোষ ভাবিতেছে; মনকে দোষারোপ করিয়া তাহাকে আত্মা হইতে পৃথক গণ্য করিতেছে। বস্তুত আত্মাই পতিত হইয়া গিয়াছে উহাকে পবিত্র করিতে হইবে। অতএব মানুষের এইরূপ চিন্তা করা উচিৎ নহে— "কী করি, মন বড় চঞ্চল, এইদিক সেইদিক করিতেছে, মন্দের দিকে যাইতেছে" ইত্যাদি। বরঞ্চ এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে যে আমিই (আত্মা) ভাল মন্দ চিন্তা এবং কার্য করিবার অধিকারী। তাই বিবেক প্রসূত চিন্তার দ্বারা আমি সংকল্প করিতেছি যে আমি আর মন্দ কার্য করিব না। পূর্বের অভ্যাসের জন্য যদি কখনও আমার বৃত্তি অসৎ হইতে আরম্ভ করে অথবা মনে অশুদ্ধ সংকল্প আসে, তবে জ্ঞান-শক্তি দ্বারা স্বয়ং উহাকে সংযত করিয়া আপন দৃষ্টিবৃত্তি এবং কর্মকে পবিত্র করিব। এতদিন যাবৎ মন, বুদ্ধি ও সংস্কার পৃথক ভাবিবার পরিণাম স্বরূপ দুঃখ এবং অশান্তি ভোগ করিয়া আসিতেছি। এখন আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে দুশ্চিন্তার জন্য দায়ী আমি

নিজেই। অতএব আর অসৎ চিন্তা, অসৎ কার্য করিব না।

মন ও বুদ্ধি আত্মার চেতনার বিভিন্ন অভিব্যক্তির নাম মাত্র

কোন ব্যক্তি যখন কোন বিচারালয়ে কোন মোকদ্দমার বিচার করিয়া রায় দেন তখন তাঁহাকে লোকেরা বিচারক বলে। ঐ একই ব্যক্তি যখন গৃহে ফিরিয়া আপন পুত্র-কন্যাদের স্নেহপূর্বক আদর করেন, তখন ঐ পুত্র কন্যারা তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করে। আবার তিনি যখন মিত্র অথবা বন্ধুদের মাঝে থাকেন, তখন বন্ধু-বান্ধবগণ তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করেন। সুতরাং একই মানুষ কর্তব্য-ভেদ, অধিকার ভেদ ও সম্বন্ধভেদে বিভিন্ন উপাধিতে পরিচিত হয়। এই রকম আত্মা যখন সঙ্কল্প, ইচ্ছা বা কামনা করে তখন আমরা এইরূপ বলি যে আমাদের মন চায়। আর আত্মা যখন কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়া উহার বিচার করে তখন আমরা বলি আমাদের বুদ্ধি এই কথাই বলে বা এইরূপ রায় দেয়। প্রকৃতপক্ষে আত্মার ইচ্ছা, কামনা, কল্পনা বা অনুভূতির নাম মন এবং আত্মার বিচার, নির্ণয়, ধারণা, জ্ঞান, স্মৃতি ইত্যাদির নামই বুদ্ধি।

মন ও বুদ্ধির সহিত মস্তিষ্কের পার্থক্য

স্বপন — কেহ কেহ বলেন মস্তিষ্ক অথবা ব্রেন্‌ই (Brain) চিন্তা করে, কামনা করে এবং শরীর দ্বারা কার্য করে। ইহা কি সত্য?

ব্রহ্মাকুমারী — ব্রেন্ (Brain) অথবা মস্তিষ্ক আত্মার নিয়ন্ত্রণালয় (Control room)। যেমন মোটর গাড়ির চালক গাড়ির একস্থানে বসিয়া বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে গাড়ি চালায়; সম্মুখ ও পশ্চাতের চলমান লোকজন ও গাড়ি দেখিয়া প্রয়োজন মত উহাকে নিয়ন্ত্রিত করে, সেইরূপ আত্মা মস্তিষ্ক দ্বারা সমস্ত শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে অথবা শরীরের অংশ বিশেষকে কার্যে লাগায়। যেমন, কথা বলিবার জন্য মুখই একমাত্র যন্ত্র, তেমনই চিন্তা করিবার, স্মরণ করিবার কর্মেন্দ্রিয়কে নির্দেশ দান অথবা কর্মেন্দ্রিয় হইতে সংবাদ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মস্তিষ্ক ও আত্মার নিকট এক যন্ত্র বিশেষ।

শরীরের যে কোন ক্ষেত্রের অনুভূতিকে মস্তিষ্ক অথবা নিয়ন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবার যে সকল স্নায়ু আছে সেসকল মস্তিষ্কে মিলিত হইয়াছে। আত্মা ঐ সমস্ত স্নায়ুর দ্বারা শরীরকে কার্যে লাগায় এবং সুখ দুঃখ অনুভব করে। পরন্তু মস্তিষ্ক আত্মা হইতে পৃথক। মস্তিষ্ক প্রকৃতির তত্ত্বে সৃষ্টি, কিন্তু আত্মা চৈতন্য শক্তি বা সত্ত্বা।

স্বপন — আত্মা শরীরের কোন স্থানে বাস করে?

ব্রহ্মাকুমারী — আত্মা শরীরে ভ্রূকুটীদ্বয়ের মধ্যস্থলে নিবাস করে। এই জন্য ঐ স্থানে টিপ, ফোঁটা বা তিলক লাগাইয়া উহাকে সূচিত করিবার প্রথা আছে। কালক্রমে লোকে ঐ তিলক, ফোঁটা বা টিপের তাৎপর্য ভুলিয়া গিয়াছে। বাস্তবপক্ষে আমাদিগকে আত্মার স্বরূপে স্থিত হইতে হইবে, কিন্তু ভক্তগণ তাহার পরিবর্তে টিকা বা ফোঁটা লাগাইয়াই কর্তব্য সমাধা করে। মাতাগণ ললাটে যে সিঁদুরের বিন্দু দেন তাহাও এই রহস্যের পরিচয় দেয় যে বিন্দুরূপ আত্মা ভ্রূকুটীর মধ্যে থাকে।

এইরূপ কথিত আছে 'ভ্রূকুটী মাঝে জ্বল জ্বল করিতেছে অদ্ভুত এক তারকা'। যখন মানুষ অশান্ত হইয়া কোন কিছু বিবেচনা করিতে অসমর্থ হয় তখন সে ভ্রূকুটীর উপর হাত রাখে। আবার মানুষ যখন ভাগ্যের ভাল-মন্দ বলে তখনও সে ঐ স্থান নির্দেশ করে, কারণ ভোক্তা আত্মা স্বয়ং ঐস্থানে থাকে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক মানুষের ভ্রূকুটী শরীরের অন্যস্থান হইতে অধিক উজ্জ্বল। ইহার কারণ জ্যোতি স্বরূপ আত্মা ঐ স্থানে নিবাস করে।

আত্মার রূপ কী প্রকার?

জ্যোতি স্বরূপ আত্মা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এক জ্যোতির্বিন্দুর ন্যায়। আকাশের নক্ষত্র যেমন পৃথিবীর লোকের নিকট ছোট আলোক বিন্দুর ন্যায় প্রতীত হয়, তেমনি আত্মা এক জ্যোতির্বিন্দু অথবা চৈতন্য জ্যোতি কণা, যাহা শরীরস্থ ভ্রূকুটির মধ্যে বাস করিতেছে। যতক্ষণ আত্মা শরীরের মধ্যে থাকে এবং মস্তিষ্ক ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কার্য করিতে থাকে ততক্ষণ মানুষকে জীবন্ত বলা হয়। যখন এই আত্মা

শরীররূপী আধার ত্যাগ করিয়া যায়, তখন মস্তিষ্কের কার্য, ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহার ইত্যাদি সবই বন্ধ হইয়া যায়। আত্মার অভিব্যক্তি তথা কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে কার্যে প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত আত্মার মুখ্য সাধন অথবা নিয়ন্ত্রণালয় (Control room) হইতেছে মস্তিষ্ক। হৃদয় শরীরের সরবরাহ কেন্দ্রের ন্যায়, অর্থাৎ জীবন সঞ্চার এবং রসদ প্রেরণ করিবার যন্ত্র। এই শরীর দ্বারা কর্মভোগের হিসাব নিকাশ যখন সমাপ্ত হয় তখন আত্মারূপী পক্ষী এই অস্থি চর্মের পিঞ্জর ছাড়িয়া উড়িয়া যায় এবং আপনার সংস্কার অনুযায়ী অপর এক হাড় ও মাংসের পিঞ্জরের আধার লয়।

এই সংসার রূপ পান্থশালায় আত্মা কোথা হইতে আসে?

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে এই আত্মারূপী অবিনাশী চৈতন্য-সত্তা এই সংসার রূপ পান্থশালায় কোথা হইতে আসে এবং সবশেষে যায়ই বা কোথায়? প্রকৃতি হইতে ভিন্ন পুরুষ (আত্মা) অন্য কোন লোক হইতে এই সংসারে ক্রীড়া করিবার নিমিত্তে অথবা এখানকার দৃশ্য দেখিবার নিমিত্তে আসে। যাহা হউক, উহার সম্বন্ধে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে তিন লোকের (Three Worlds) রহস্য অবহিত হওয়া দরকার।

তিন লোকের রহস্য

আত্মার নিবাসস্থল জানিবার জন্য তিন লোকের জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। পরমাত্মাকেও ত্রিলোকীনাথ বলা হয়। আপনি কি জানেন ঐ তিন লোক কী কী, আর উহাদের মধ্যে কোন লোক হইতে আত্মা এই সৃষ্টি মঞ্চে আসিয়াছে? পরমপিতা পরমাত্মা শিব আমাদিগকে দিব্য দৃষ্টির বরদান দিয়া এই তিন লোকের সাক্ষাৎকার করাইয়াছেন। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র ও এই পৃথিবী লইয়া যে বিরাট স্থূল সৃষ্টি উহাকে সাকার সৃষ্টি বা সাকার জগৎ (corporeal world) বলা হয়। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তাহা এই স্থূল সৃষ্টির সামান্য অংশ মাত্র। ইহাকে মনুষ্যলোক, কর্মক্ষেত্র অথবা রঙ্গমঞ্চও বলা হয়, কেন না এইখানে আসিয়াই আত্মা স্থূল অর্থাৎ হাড়-

মাংসের শরীর ধারণ করে এবং সুখ ও দুঃখের খেলা খেলিয়া থাকে। এইখানে জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, কর্ম-বিকর্ম, সঙ্কল্প, বচন ইত্যাদি সবই আছে। এইখানে সর্বদাই মনুষ্য সৃষ্টির নাটক অভিনীত হইয়া চলিয়াছে।

সূক্ষ্মলোক

এই মনুষ্য সৃষ্টি ছাড়াইয়া, সূর্য ও নক্ষত্রগণের উপরে, আকাশ তত্ত্বেরও পরপারে এক শুভ্র-জ্যোতির্লোক বিরাজমান, যাহাকে সূক্ষ্ম দেবলোক বলা হয়। এই সূক্ষ্ম দেবলোকে ব্রহ্মাপুরী, বিষ্ণুপুরী এবং শঙ্করপুরী অবস্থিত। তিন সূক্ষ্ম দেহধারী দেবতা যথা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কর আপন আপন পুরীতে বিরাজমান রহিয়াছেন। ঐ দেবতাদের দেশে যে সমস্ত দেবতারা বাস করেন তাঁহাদের আমাদের ন্যায় হাড় ও মাংসের কোন স্থূল শরীর নাই। তাঁহাদের সূক্ষ্ম প্রকাশময় শরীর। স্থূল দৃষ্টি দ্বারা তাঁহাদিগকে দেখা যায় না, কিন্তু দিব্য দৃষ্টির দ্বারা তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে পারা যায়। ঐ লোকে মনুষ্য লোকের ন্যায় জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি অথবা শোক-দুঃখ নাই। মুখের বচন বা ধ্বনিও ঐ স্থানে হয় না। দেবতাদের কথায় ধ্বনি সৃষ্টি হয় না। ঐ স্থানে কেবল গতি আছে, কিন্তু কোন ধ্বনি বা শব্দ নাই।

পরমধাম, ব্রহ্মলোক, পরলোক বা নির্বাণধাম

সূক্ষ্ম দেবলোকেরও পরে অন্য এক লোক আছে, যাহাকে পরমধাম, ব্রহ্মলোক অথবা পরলোক বলা হয়। ঐ লোকে স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন প্রকারেরই শরীর নাই। ঐখানে সঙ্কল্প, বচন ও কর্ম কোনটাই হয় না। ঐখানে চিরশান্তি বিরাজমান। এইজন্য উহাকে শান্তিধাম, মুক্তিধাম, বা নির্বাণধাম বলা হয়। সূক্ষ্মলোকে স্বর্ণাভ লোহিত জ্যোতি তত্ত্ব পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে তাহাকে ব্রহ্ম বলে। এই ব্রহ্ম-তত্ত্ব চৈতন্য সত্তা নয়, কিন্তু প্রকৃতির পঞ্চ তত্ত্ব ও সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ গুণ হইতে স্বতন্ত্র।

জন্ম মৃত্যু চক্রের রহস্য অবগত অজন্মা, অভোক্তা, ত্রিকালদর্শী পরমপিতা পরমাত্মা শিব আমাদিগকে এই গূঢ় রহস্য ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে সূর্য এবং

নক্ষত্রগণের পরপারে অখণ্ড জ্যোতি ব্রহ্মতত্ত্বে আত্মাগণ অশরীরী সঙ্কল্প-বিকল্প রহিত, সুখ দুঃখ ও জন্ম মৃত্যু হইতে মুক্ত অবস্থায় থাকে। ঐ স্থান হইতে আত্মাগণ এই সৃষ্টি রূপী রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে আসে এবং ভূমিকা অনুযায়ী দেহ রূপ বেশ ধারণ করে। আকাশে উল্কা-পাতের ন্যায় আত্মাগণ আপন আপন অভিনয় করিবার জন্য মুক্তি ধাম ছাড়িয়া ইহলোকে প্রবেশ করে। আবার কর্ম অনুসারে ফল ভোগান্তে নিজধামে প্রত্যাবর্তন করে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে মনুষ্যাত্মা আপন-স্বরূপকে কেমন করিয়া ভুলিল? কথিত আছে এক রাজার রাজপ্রাসাদ জঙ্গলের নিকট অবস্থিত ছিল। একদিন রাজকুমার খেলিতে খেলিতে এক ভেড়ার দলের সহিত চলিয়া গেল। রাজকুমার ভেড়ার দলে ভেড়াদের সহিত লালিত পালিত হইতে লাগিল। অনেক দিন পর রাজা শিকার করিতে জঙ্গলে গিয়া দেখিলেন যে ভেড়ার দলে এক মানব শিশু। রাজা উহাকে উদ্ধার করিয়া নগরে আনয়ন করিলেন। দীর্ঘদিন ভেড়ার দলে থাকিয়া রাজকুমারের আকৃতি প্রকৃতি অনেক পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার নখ অত্যন্ত বড়-বড়, চুল লম্বা-লম্বা হইয়া গিয়াছিল, আর শরীর ধূলা-মাটিতে ভরিয়া গিয়াছিল। সে ভেড়ার মতো শব্দ করিতেছিল অর্থাৎ ভেড়ার সঙ্গে থাকিয়া ভেড়া হইয়া গিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে রাজার মনে পড়িয়া গেল যে এই ভেড়ার জীবন যাপনকারী মানব শিশুই তাঁহার হারানো রাজকুমার। তখন তাহাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হইল। রাজকুমারের ন্যায় বেশভূষা পরানো হইল, চাল-চলন ও ব্যবহারিক শিক্ষা দিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করা হইল। শিক্ষক তাহাকে শিক্ষা দিতে লাগিল যে— "তুমি ভেড়া নও, জঙ্গলবাসী নও, রাজকুমার। এই জঙ্গল ও নগর তোমার পিতার রাজ্য।" এই রূপ শিক্ষার ফলে রাজকুমারের চাল-চলন, কথাবার্তা ও আচার ব্যবহারের মধ্যে পরিবর্তন আসিল। তাহার মনে এই ভাবের উদয় হইল যে—"আমি রাজকুমার—!"

সকল রাজ্যের উত্তরাধিকারী, তেমনই মনুষ্যাত্মাগণ-দেবতাদেরও দেবতা

ত্রিলোকীনাথ, পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। কিন্তু শরীর ও কর্মেন্দ্রিয়ে বন্ধনে নিজেদের শরীর বলিয়া ভাবিতেছে ও বিষয় বিকারে ডুবিয়া গিয়াছে। এখন পরমপিতা পরমাত্মা এই জ্ঞান দিতেছেন—"হে আত্মাগণ, তোমরা প্রকৃত পক্ষে আমার অর্থাৎ ত্রিলোকীনাথ পরমপিতা, পরমাত্মার সন্তান। তোমরা স্বর্গের দিব্য সুখ তথা রত্নাদি খচিত সুবর্ণ রাজপ্রাসাদে থাকিয়া সম্পূর্ণ পবিত্রতা তথা সুখ শান্তি সম্পন্ন রাজ্য ভোগ করিতেছিলে। কিন্তু সৃষ্টির আবর্তনে জন্ম-জন্মান্তর দেহের বন্ধনে আসিতে আসিতে দেহের উপর আসক্ত হইয়া পড়িয়াছ এবং নিজেকে (আত্মাকে) ভুলিয়া 'দেহ' মনে করিতেছ।"

স্বপন — আত্মা কী এক জন্ম লয়,না পুনর্জন্মও লাভ করে? বহু লোক পুনর্জন্মই মানে না, তাহারা বলে, অপর জন্ম কি কেহ দেখিয়াছে?—এই জন্মই সব কিছু!

ব্রহ্মাকুমারী — আত্মা অবশ্যই পুনর্জন্ম লয়। কেন না দেখা যায়, সংসারে কেহ সুশিক্ষিত, সভ্য, কুলীন এবং ধনবান মাতা পিতার ঘরে আবার কেহ অশিক্ষিত অসভ্য এবং নির্ধন মাতা পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করে। এখন বলুন, ইহার কারণ কী? বিনা কারণে কোন কার্যই হয় না। অতএব এই বিভিন্ন পরিস্থিতি যথা ধনী-নির্ধন, রোগী-নিরোগ, স্ত্রী-পুরুষ রূপে জন্ম হওয়া কি এই সিদ্ধ করে না যে প্রত্যেক আত্মার পূর্ব জন্মের—কিছু এমন কর্ম ছিল যাহার ফল সে ঐ জন্মে ভোগ করিয়া শেষ করিতে পারে নাই। শরীর ত্যাগ করিবার পর আপন কর্ম এবং সংস্কার অনুযায়ী পুনরায় কর্মানুসারে সেই পরিবেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে?

স্বপন — দিদি, এই জন্মে আমি যে সকল সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছি তাহা কি পূর্বজন্মের কর্মফল?

ব্রহ্মাকুমারী — না, এই জন্মে আমরা যে সুখ-দুঃখ ভোগ করি তাহার কিছুটা পূর্বজন্মের কর্মের ফল এবং বাকিটা এই জন্মের কৃত কর্মের ফল।

স্বপন — দিদি, আত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণ করিলে পূর্ব জন্মের কোন কিছু স্মরণ থাকে না কেন?

ব্রহ্মাকুমারী — পূর্ব জন্মের কথা কী আর বলিব, আত্মা এই জন্মেরই অনেক কথা বা ঘটনা ভুলিয়া যায়! যেমন আত্মার মধ্যে স্মৃতিশক্তি আছে, তেমনি আবার অল্পজ্ঞ আত্মার স্বভাব বিস্মৃত হওয়া। ইহা প্রায়ই দেখা যায়, মানুষ দুই-এক মাসের আগের ঘটনাও ভুলিয়া যায়। নিদ্রার পর; মানসিক আঘাতের পর মূর্ছার পর অথবা স্থান, সম্বন্ধ এবং পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অনেক কথা ভুলিয়া যায়। এই রূপ মৃত্যুও এক প্রকার ঘটনা যাহার ফলে মানুষ অনেক কথাই ভুলিয়া যায় অল্প যাহাও বা মনে থাকে, শৈশব অবস্থার জন্য সে তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না। আপনারা দেখিয়া থাকিবেন, জন্মাইবার অল্পক্ষণ পরেই শিশু কখনও বা কাঁদে, কখনও - বা হাসে। তাহার নিকট দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত কোন ব্যক্তি বা বস্তু যদি নাও থাকে, তথাপি সে কাঁদিতে বা হাসিতে থাকে এখন বলুন, ঐ শৈশব অবস্থায় যখন তাহার সাংসারিক লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয় কোন কিছুরই অনুভূতি নাই তখন কোন্ কারণে সে কাঁদে বা হাসে? ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে পূর্বজন্মের কাহিনী উহার স্মরণে আসিতেছে। কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গর পরিপূর্ণ বিকাশ না হওয়ার জন্য সে মুখ দ্বারা তাহার ঐ অনুভূতি ব্যক্ত করিতে পারিতেছে না। সংবাদ পত্রে আমরা এইরূপ খবর প্রায়ই পাই যে শিশু জন্মাইবার কিছু দিন পর অর্থাৎ শৈশবে সে আপনার পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত বলিতেছে। পূর্ব জন্ম বৃত্তান্ত বলিবার সময় সে নিজের মৃত্যুর কারণও বলিতেছে এবং তাহার ঘর ও মাতা-পিতার নামও বলিতেছে। কিন্তু সকল শিশুই পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত বলিতে পারে না। বাস্তবিক-পক্ষে পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ না থাকা ভাল। কারণ তাহাতে অনেক প্রকার অসুবিধা ও জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইতে পারে। যেমন ধরুন কোন ব্যক্তি বাজার যাইবার পথে অন্য ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল যে ঐ ব্যক্তি তাহাকে পূর্ব জন্মে প্রহার করিয়াছিল, তাহা হইলে ঐ সময়ে উভয়েই বিবাদে লিপ্ত হইয়া পড়িবে। আবার ধরুন, স্কুল যাইবার পথে কোন বালকের মনে পূর্ব জন্মের স্মৃতি ফিরিয়া আসিল এবং পথে চলমান কোন স্ত্রী-পুরুষকে দেখিয়া চিনিয়া ফেলিল যে তাহার পূর্ব জন্মের মাতা-পিতা। তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ স্কুল ভুলিয়া তাহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য

পিতাশ্রী প্রজাপিতা ব্রহ্মা

পরমপিতা শিব পরমাত্মা কল্পের শেষে এই মানব শরীরে প্রবিষ্ট, সন্নিবিষ্ট বা অবতারিত হইয়া গীতা জ্ঞান ও সহজ রাজযোগের শিক্ষা দিয়া মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠ দেবতায় পরিণত করেন।

সৃষ্টিরূপী কল্প বৃক্ষ

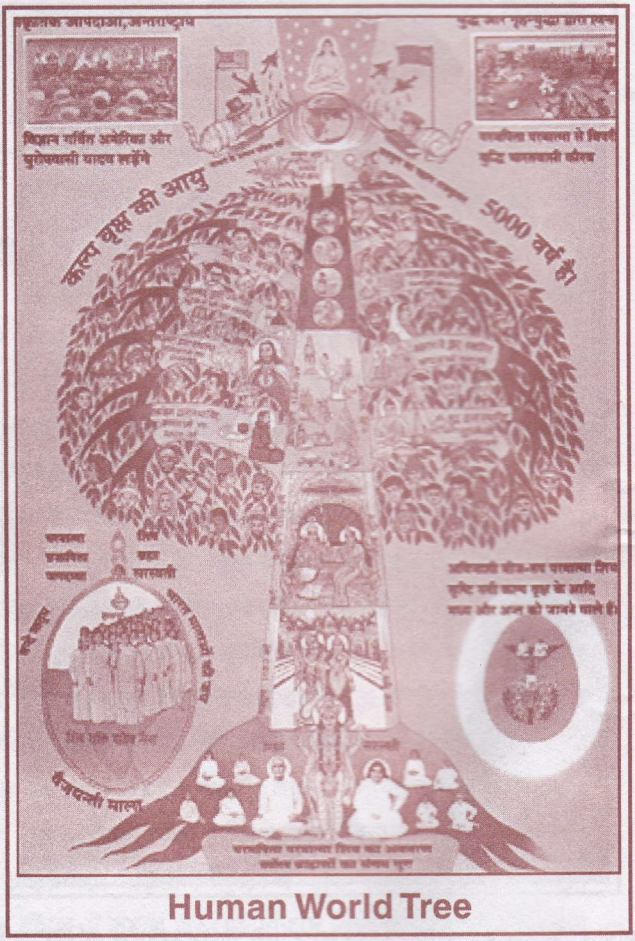

Human World Tree

এই চিত্রে বিভিন্ন ধর্ম-বংশ সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তরে সম্পূর্ণ ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে।

পথ ধরিবে। এদিকে তাহার এই জন্মের মাতা-পিতা তাহাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ব্যাকুল হইবে। সুতরাং পূর্ব জন্মের কথা মনে না থাকাই ভাল কারণ তাহাতে মানুষের জীবনে জটিলতা বাড়িবে। আবার পূর্ব জন্মের বৃত্তান্ত মনে থাকিলে এই জন্মে উত্তম কার্যে ও কর্মফল ভোগে বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে।

স্বপন — পূর্ব জন্মের কর্মফল ভোগ হইতেছে অথবা পূর্বে আমার জন্ম হইয়াছিল ইহা কেমন করিয়া বুঝিব?

ব্রহ্মাকুমারী — আপনাকে বলিয়াছি যে এক ব্যক্তির সহিত অন্য ব্যক্তির জন্মের পারিপার্শ্বিক ও পারিবারিক অবস্থার তারতম্যই সূচীত করে যে পূর্ব-জন্মের কর্মফল অনুযায়ী ঐরূপ হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, দেখা যায় যে কাহারও ভিতর কাম এবং কাহারও মধ্যে ক্রোধের সংস্কার বিদ্যমান। ইহার কারণ পূর্বে নিশ্চয় সে এইরূপ কার্য করিয়া থাকিবে অর্থাৎ তাহার পূর্বে জন্ম হইয়াছিল। আবার একই মায়ের দুই সন্তানের মধ্যে অনেক বিষয়ে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের পিতা-মাতা একই, ভোজন একই প্রকার; অথচ দুইজনের সংস্কার, স্বভাব ভাগ্য তথা পুরুষার্থের কর্ম ও সংস্কার মানিতেই হইবে। আপনি ইহাও দেখিবেন, কেহ হয়ত অল্প বয়সেই কোন বিদ্যা বা কলাতে অসাধারণ পারদর্শীতা দেখায়, আবার কেহ পিতা-মাতা এবং অধ্যাপকের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুমাত্র উৎকর্ষ সাধন করিতে সক্ষম হয় না। কেহ প্রসিদ্ধ গায়ক হয়, কেহ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে, আবার কেহ মূর্খ হইয়াও কুশল ব্যবসায়ী সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই সকল হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে মানুষ পূর্ব জন্মে যে কার্য বা অভ্যাস করিয়া থাকে বর্তমান জন্মে তাহার সেই কার্য বা অভ্যাসের স্বাক্ষর পাওয়া যায়।

ইহা ছাড়া মানুষের মনে মুক্তি বা সুখ শান্তির ইচ্ছা অথবা মৃত্যু ভয় ইত্যাদি হইতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে আত্মা নিশ্চয়ই পূর্বের কোন না কোন জন্মে সম্পূর্ণ সুখ-শান্তি অনুভব করিয়া থাকিবে অথবা পূর্বের জন্মে মৃত্যুর যন্ত্রণা অনুভব করিয়া থাকিবে,

বহুবার দুঃখ ভোগ করিবার ফলে এখন সে মুক্তি চাহিতেছে। এই সমস্ত হইতে ইহাই প্রমানিত হয় পুনর্জন্ম আছে। শিশু জন্মাইবার পর বিনা শিক্ষাতেই স্তন্যপান করে, ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সে পূর্বে জন্ম লইয়াছে এবং পূর্বাভ্যাস বা অভিজ্ঞতা তাহার আছে।

স্বপন — দিদি, আমরা আদি সনাতন ধর্মের লোকেরা পূর্ব-জন্ম স্বীকার করি। কিন্তু অন্যান্য ধর্মাবলম্বী কিছু কিছু লোক এইরূপ মন্তব্য করেন যে মনুষ্য একবার জন্ম গ্রহণ করিবার পর দ্বিতীয়বার আর জন্ম গ্রহণ করে না, অর্থাৎ মৃত্যুর পর কবর দাখিল হইয়া থাকে। মহাবিনাশ কালে, পরমাত্মা আসিয়া কবর হইতে উদ্ধার করিয়া মনুষ্যকে কর্মফল প্রদান পূর্বক ফিরাইয়া লইয়া যান।

ব্রহ্মাকুমারী — হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলিয়াছেন, কোন কোন ব্যক্তি এইরূপ বলিয়া থাকেন; কিন্তু বাস্তবপক্ষে ইহার তাৎপর্য হইতেছে মনুষ্য একবার জন্ম লইবার পর সে কল্পের শেষ পর্যন্ত পুনর্জন্ম লইতেই থাকে। কল্পান্তে মনুষ্যাত্মা একেবারে অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, যাহা কবর দাখিলেরই সামিল। এইরূপ অবস্থায় পরমাত্মা সৃষ্টিতে অবতীর্ণ হইয়া ঈশ্বরীয় জ্ঞান দ্বারা সকল মনুষ্যাত্মাকে কবর হইতে উদ্ধার করেন অর্থাৎ অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগরিত করেন এবং উহাদের পরমধামে লইয়া যান। লোক কবর দাখিলের প্রকৃত অর্থ না জানার জন্য এইরূপ মন্তব্য করে যে মনুষ্যাত্মা একবারই জন্মগ্রহণ করে! ভাবিয়া দেখুন, মনুষ্যাত্মা যদি পুনর্জন্ম না লয়, তবে জনসংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতেছে কেন? প্রতিদিন জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হইতেছে যে আগের আত্মাগুলি পুনর্জন্ম লইয়াই চলিয়াছে; আর প্রতিদিন নূতন নূতন আত্মা সৃষ্টিতে আগমন করিতেছে। **চারিত্রিক উন্নতির জন্য পুনর্জন্ম মানা বিশেষ প্রয়োজন**। কারণ এই জন্মের কর্মফল আগামী জন্মে ভোগ করিতে হইবে, এই ভয় যদি না থাকে তবে মনুষ্য নিজ কর্মের উৎকর্ষের প্রতি মনোযোগ না দিয়া অন্যের অনিষ্ট করিয়াও নিজে সুখী হইবার চেষ্টা করিবে; ইহাতে সংসারে উশৃঙ্খলতা বাড়িয়া যাইবে।

স্বপন — দিদি, আপনি ঠিকই বলিয়াছেন; পুনর্জন্ম যে হয়, সে বিষয়ে আমার ধারণা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মাকুমারী — পুনর্জন্ম না মানিলে আপনি জানিতে পারিবেন না যে আত্মা অপবিত্রতা, দুঃখ এবং অশান্তির বর্তমান অবস্থায় কেমন করিয়া পৌঁছাইল। আত্মা প্রকৃতপক্ষে স্বধর্ম অনুযায়ী পবিত্র এবং শান্ত স্বরূপ, সেইজন্যই তাহার শান্তি লাভের ইচ্ছা হয়। ইহা সুস্পষ্ট যে কোন কারণবশতঃ উহা সেই পবিত্র এবং শান্ত অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। কাম-ক্রোধাদি পাঁচ বিকার উহার পতনের কারণ। এই সমস্ত কারণের মধ্যে দেহাভিমানই (Body Consciousness) সর্বপ্রধান। অতএব এখন আপনার প্রকৃত স্বরূপকে জানিয়া পূর্বের পবিত্র ও শান্তিময় স্থিতি প্রাপ্ত করিবার অভ্যাস করুন।

ইহা বলিবার উদ্দেশ্য হইতেছে, দেহ বোধ ছাড়িয়া নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করুন। এই দেহাভিমানের জন্যই মানুষের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহঙ্কার ইত্যাদি বিকার বর্তমান। লোকে বলে আমরা এইগুলি ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু ইহারা আমাদের ত্যাগ করিতে চাহে না। তাহারা এই বিকারকে ছাড়িবে কী করিয়া? ইহাদের মূল দেহাভিমান, যতদিন না তাহাকে ত্যাগ করিবে অর্থাৎ **যতদিন স্বয়ং দেহের পরিবর্তে আত্মা নিশ্চয় না করিবে ততদিন এই বিকার কিছুতেই দূর হইবে না।** যখন মানুষ কাহারও দেহকে দেখে, স্ত্রী-পুরুষ পার্থক্য বোধ করে ও দৈহিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয় তখনই তাহার মনে কামনার উৎপত্তি হয়। এই ধরনের মানুষ দৈহিক বয়স বিবেচনা করিয়া একজন অপরজন হইতে বড় বিবেচনায় ঐ ব্যক্তি বয়সে ছোট হওয়া সত্ত্বেও তাহার কথা শুনিতেছে না, বোধে তাহার মনে ক্রোধের সঞ্চার করে। এইরূপ নিকট দৈহিক সম্পর্কযুক্ত-গণ যেমন স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি মনে মোহভাব আনিয়া দেয় এবং তাহাদের জন্য লোভের বশীভূত হইতে হয়। এই দেহাভিমান মানুষকে অত্যন্ত দুঃখী করিয়াছে। মানুষ ইহার হাত হইতে রক্ষা পাইতেছে না, কারণ সে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করিতে পারিতেছে না। এই দেহাভিমানকে

অতিক্রম করিবার উপায় বা পথ হইতেছে যে কোন ব্যক্তির দেহকে না দেখিয়া তাহার ভ্রূকুটি মধ্যস্থ আত্মাকে দেখিবার অভ্যাস করা। মনে করিতে হইবে আমি স্বয়ং আত্মা মুখ দ্বারা বলিতেছি, এবং যে আমার কথা শ্রবণ করিতেছে সেও আত্মা। শরীর দ্বারা কার্য করিবার সময় মনে করিতে হইবে, আমি আত্মা এই শরীর দ্বারা কার্য করিতেছি। এইরূপ অভ্যাসের দ্বারা আত্মিক-স্থিতিও পরিপক্ক হইতে থাকিবে এবং আত্মাও পবিত্র হইয়া যাইবে।

পরমাত্মার নিকট হইতে শান্তি ও শক্তি লাভের উপায়

শান্তি ও শক্তি পাইবার জন্য মানুষ ঈশ্বরকে স্মরণ করে, কিন্তু সে নিজের প্রকৃত পরিচয় জানে না। যদি নিজেকে না জানে, তাহা হইলে আপনার পিতাকে কী করিয়া জানিবে? তাঁহার সহিত স্নেহ-প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া শান্তি ও শক্তি কেমন করিয়া পাইবে? যেমন 'পাওয়ার হাউসের' (Power House) বৈদ্যুতিক তারের সহিত ঘরের তার জুড়িতে হইলে উভয় তারের রবার অপসারিত করিতে হয়, নতুবা তড়িৎ প্রবাহ চলাচল সম্ভব হয় না, তেমনি দেহাভিমান রূপ রবার অপসারিত না করিতে পারিলে ঈশ্বরের সহিত যোগ যুক্ত হওয়া যায় না। তাঁহার নিকট হইতে শান্তি ও শক্তি পাওয়া যায় না। সুতরাং দেহাভিমান ছাড়িয়া স্বয়ংকে জ্যোতিস্বরূপ আত্মা নিশ্চয় করিলে জ্যোতিস্বরূপ পরমপিতা-পরমাত্মার স্মরণ ঐ 'মেন পাওয়ার হাউস' (Main Power House) অর্থাৎ শান্তির সাগর, আনন্দের সাগর, সর্বশক্তিমান পরমপিতা পরমাত্মার নিকট হইতে শান্তি, শক্তি ও আনন্দ লাভ হয়। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করিতে পারিলেই স্মৃতিরূপ তার পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইয়া যাইবে এবং আনন্দ, শান্তি ও শক্তি লাভ করা সম্ভব হইবে।

অতএব আজ হইতে এই বোধ নিশ্চিত করুন যে এই দেহ আমার বস্ত্র, আর আমি অবিনাশী আত্মা। দেহের সঙ্গে অন্য দেহের সম্বন্ধ স্বল্প স্থায়ী। দেহকে দেখার অর্থ বস্ত্রকে দেখা আসল সত্ত্বা না দেখা। দেহের মধ্যে যে আসল সত্ত্বা আত্মা তাহাকে

জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা দেখিতে হইবে। তাহা হইলেই মনে মোহ-মমতা, আসক্তি ইত্যাদি উৎপন্ন হইবে না, দৃষ্টি-বৃত্তিতে কামনার উদ্রেক ঘটিবে না।

প্রশ্ন

১) আত্মার পরিচয় কী?

২) মন, বুদ্ধি ও সংস্কার কাহাকে বলে এবং আত্মার সহিত উহাদের সম্বন্ধ কী?

৩) আত্মা কোথা হইতে এই সৃষ্টি রূপী রঙ্গ মঞ্চে আসে?

৪) পুনর্জন্মের মুখ্য প্রমাণগুলি সংক্ষেপে বলুন।

৫) দেহাভিমান হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কী?

৬) মন ও বুদ্ধির সহিত মস্তিষ্কের পার্থক্য কী?

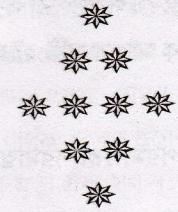

ঈশ্বরের প্রকৃত পরিচয়

ব্রহ্মাকুমারী — পরিচয় পত্রে আপনার পিতার নাম, নিবাস-স্থান ও পেশা লিখিয়াছেন?

স্বপন — আজ্ঞে হাঁ!

ব্রহ্মাকুমারী — যদি আপনার কোন ভাই বা ভগিনীকে পিতার নাম জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা হইলে সে কি ঐ একই পিতার নাম বলিবে না ভিন্ন উত্তর দিবে?

স্বপন — দিদি, সেও ঐ একই উত্তর দিবে। যখন তাহার পিতাও একই, তখন উভয়ের উত্তরের মধ্যে পার্থক্য কেন হইবে?

ব্রহ্মাকুমারী — আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। কাল আপনাকে বলিয়াছিলাম যে আপনি শরীর নন, শরীররূপ বস্ত্র ধারণকারী এক আত্মা। সেই রকম অন্যান্য সকল দেহধারীও প্রকৃতপক্ষে আত্মা। সকলে বলে যে পরমাত্মা এক (God is one)। কিন্তু পরমাত্মার নাম, ধাম ইত্যাদি বিষয়ে একজন যাহা কিছু বলে, অন্যে তাহা হইতে ভিন্ন মত পোষণ করে। অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে পরমপিতা পরমাত্মার বিষয়ে তাহারা সম্যক্ অবহিত নহে। সেই জন্য অনেক মতের সৃষ্টি হইয়াছে এবং মানুষের মনে এত সংশয় উঠিতেছে।

স্বপন — হাঁ, ইহা ঠিক কথা। পরমপিতা পরমাত্মার সত্য পরিচয় একই হওয়া উচিত।

ঈশ্বর সম্পর্কে অনেক মতের কারণ

ব্রহ্মাকুমারী — ঈশ্বর সম্পর্কে বিভিন্ন মত ইহাই প্রমাণ করে যে মানুষ আপন আত্মার পিতাকে জানে না। সেইজন্য অনেক মানুষই এই কথা বলে যে ঈশ্বরের কোন রূপ নাই। বিবেচনা করিয়া দেখুন যে রূপহীন কোন বস্তু হইতে পারে কি?

লোকে ঈশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করে "এই আঁখিদ্বয় প্রভু দর্শন পিয়াসী" অথবা "হে প্রভু কৃপা করিয়া দর্শন দাও।" অতএব ঈশ্বরের যদি কোন রূপ না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার সহিত মিলনও সম্ভব নয়। ইহা ভাবিবার বিষয় যে পরমপিতা পরমাত্মার সহিত মিলিত হইবার জন্য লোক এত সাধনা বা তপস্যা করিতেছে, তাহার যদি কোন রূপই না থাকে তবে কীসের জন্য এত প্রচেষ্টা? সুতরাং বোঝা যায় যে পরমপিতা পরমাত্মার কোন রূপ অবশ্যই আছে, জ্ঞান চক্ষু না হওয়ার জন্য লোক তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ হইতেছে না।

স্বপন — আচ্ছা, পরমাত্মার রূপ এবং পরিচয় তাহা হইলে কী?

ব্রহ্মাকুমারী — দেখুন পরমাত্মা শব্দের মধ্যে দুইটি শব্দ আছে যথা, পরম+আত্মা। অতএব পরমাত্মাও আত্মা অর্থাৎ তাঁহার কোন শারীরিক আকার নাই। তিনি সকল আত্মাগণের মধ্যে পরম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। তিনি জন্ম-মৃত্যুহীন অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর চক্রের বাহিরে। অতএব কোন দেহধারীকে পরমাত্মা বলা যায় না, কারণ দেহধারীর জন্ম-মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। পরমাত্মা সকলের পরমপিতা। অতএব যিনি সকলের পিতা, তাঁহার পিতা কেহ হইতে পারে না। সাধারণত লোকে বলিয়া থাকে, পরমাত্মা জ্যোতি বিশেষ, কিন্তু এই জ্যোতিরূপ সম্বন্ধে তাহারা সম্যক্ অবহিত নহে। আমি আপন অনুভবের (Realisation) আধারে পরমাত্মার রূপ ব্যাখ্যা করিতেছি, মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করুন। আত্মা যেমন জ্যোতির্বিন্দু, পরমাত্মাও তেমনই জ্যোতির্বিন্দু। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল গুণের। পরমাত্মা শান্তির সাগর, আনন্দের সাগর, প্রেমের সাগর, জন্ম-মৃত্যু এবং সুখ-দুঃখ রহিত এক অবিনাশী সত্তা। কিন্তু আত্মা জন্ম-মৃত্যু তথা সুখ-দুঃখের চক্রে আবর্তিত হইয়া থাকে। মানব শিশুর মাতা পিতা মানব ও পক্ষীর মাতা-পিতা পক্ষীই হয়। ঠিক তেমনই পরমাত্মা, আত্মার ন্যায় জ্যোতির্বিন্দু।

প্রায় সকল ধর্মাবলম্বী মানুষ পরমাত্মার জ্যোতির্ময় রূপের কোন না কোন প্রকার স্মারক ব্যবহার করিয়া থাকে। ভারতে কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত শিবের যে প্রতীক দেখিতে পাওয়া যায় তাহার না আছে কান, না আছে মুখ, না আছে পা,

আর না দেহ। কোথাও ইহার নাম বিশ্বনাথ, কোথাও অমরনাথ। আবার কোথাও মুক্তেশ্বর কোথাও বা পাপ-কাটেশ্বর। এই সমস্ত নামই প্রমাণ করে যে—তাঁহারা পরমাত্মার প্রতীক। কারণ বিশ্বের নাথ, অমর আত্মাগণের নাথ, মুক্তি প্রদানকারী ও পাপ হননকারী একমাত্র পরমাত্মাই। এইজন্য রামেরও ঈশ্বর হইবার জন্য রামেশ্বর নামে তাঁহার স্মারক বর্তমান। কৃষ্ণেরও ঈশ্বর হওয়ায় বৃন্দাবনে তাঁহার গোপেশ্বর নামের স্মারক বর্তমান।

ভারতের বাইরে ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের তীর্থক্ষেত্র মক্কায় এই রকম এক স্মারক আছে যাহাকে তাহারা 'সঙ্গ-এ অসবদ্' বলিয়া অভিহিত করে। ভারতবাসী মুসলমানগণ উহাকে মক্কেশ্বরও বলেন।

ইসাই ধর্ম স্থাপক ইসা পরমাত্মাকে জ্যোতিস্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহুদী ধর্ম স্থাপক হজরত্ মুসা পর্বতের উপর যে জিহোবাকে দর্শন করিয়াছিলেন—তাহাও জ্যোতি শিখার ন্যায় ছিল। শিখ্দের ধর্মগুরুনানক দেবও এক নিরাকার জ্যোতিস্বরূপের মহিমা করিয়াছেন। গুরু গোবিন্দ সিং অকাল স্মৃতি নামক গ্রন্থে "দে শিব বরদান মোহে" এইপ্রকারে পরমাত্মাকে শিব নামে অভিহিত করিয়াছেন। ভারতে শাক্তগণ শিবকে শক্তিদের সৃষ্টি কর্তা বলিয়া মানিয়া থাকেন। অতএব আমাদের সকলেরই পরমপিতা পরমাত্মার মধুর স্মৃতিতে মগ্ন হওয়া প্রয়োজন।

স্বপন — জ্যোতিস্বরূপ পরমপিতা পরমাত্মা যখন নিরাকার, তখন তাঁহার রূপ আছে এই কথা কেমন করিয়া স্বীকার করা যায়! নিরাকার তাঁহাকে বলা যায়, যাহার কোন আকার নাই। যদি পরমাত্মার রূপই আছে তবে তাঁহাকে নিরাকার কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে?

ব্রহ্মাকুমারী — দেখুন, কোন জিনিসের আকার অন্য জিনিসের তুলনা সাপেক্ষে নির্ণয় হইয়া থাকে। ছোট, বড়, পাতলা, মোটা ইত্যাদি সব বিশেষণই এক-দুয়ের তুলনা সাপেক্ষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে নিরাকার শব্দটিও সাকার ও সূক্ষ্মাকার শব্দদ্বয়ের তুলনা সাপেক্ষে ব্যবহৃত। আত্মা যখন স্থূল স্ত্রী অথবা পুরুষ

রূপ ধারণ করে তখন তাহাকে সাকার বলে। সূক্ষ্ম অর্থাৎ দিব্য প্রকাশময় কায়া বিশিষ্ট দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্করকে বলা হয় সূক্ষ্মাকার। কিন্তু পরমাত্মা এমন আত্মা যাহার না আছে স্থূল দেহ, না আছে সূক্ষ্ম-দেহ। সেই কারণে তাঁহাকে নিরাকার বলা হয়। নিরাকারের অর্থ হইতেছে শারীরিক আকার রহিত। ইংরাজি ভাষায় উহাকে Incorporeal বলা হয় অর্থাৎ যাহার কোন দৈহিক আকার বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাই। কিন্তু পরমাত্মারও আপন অবিনাশী রূপ আছে। উহা হইতেছে তাঁহার জ্যোতির্বিন্দু রূপ, যাহার স্থূল প্রতীক শিবলিঙ্গ। মানুষ আজ ভুলিয়া গিয়াছে যে এই শিবলিঙ্গ কাহার প্রতীক।

প্রজ্বলিত দ্বীপ বা মোমবাতির শিখা ডিম্বাকৃতি বিশিষ্ট অথবা শিবলিঙ্গের ন্যায় মনে হয়। পরমাত্মাও দিব্যজ্যোতি এবং তাঁহার সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্মরূপ আছে। স্থূল নেত্র দ্বারা তাহা দেখা সম্ভব নহে। তাঁহাকে দেখিতে হইলে দিব্য নেত্রের প্রয়োজন।

স্বপন — অদ্যাবধি ইহাই শুনিয়া আসিতেছি যে পরমাত্মা সর্বব্যাপী। তাহা হইলে সর্বব্যাপীর রূপ কী করিয়া হইতে পারে?

ব্রহ্মাকুমারী— পিতা কি আপনার পুত্রের মধ্যে সর্বব্যাপক হয়? পরমাত্মা সকল আত্মার পরমপিতা। অতএব সকলের মধ্যে তিনি ব্যাপক নন। যদি পরমাত্মা সর্বব্যাপক হন, তবে তাঁহার গুণও সকলের মধ্যে ব্যাপক হইত। এইরূপ কখনও হয় না যে, চিনি দুধের মধ্যে মিশ্রিত কিন্তু উহার মিষ্টতা উহাতে লভ্য নয়; অথবা অগ্নি কোন বস্তুতে বিদ্যমান কিন্তু উহার গুণ উষ্ণতা উহাতে অনুভূত নয়। যদি তিনি সর্বব্যাপক হইতেন তাহা হইলে সকলের মধ্যেই পবিত্রতা, সুখ ও শান্তি বিরাজ করিত।

স্বপন — দিদি, তাহা হইলে লোকে কেন বলে পরমাত্মার কোন রূপ নাই?

ব্রহ্মাকুমারী — কারণ তাঁহারা পরমপিতা পরমাত্মাকে জানে না। আমরা যাঁহাকে

পিতা বলিয়া স্মরণ করি তাঁহার রূপ আছে। স্বাদের রূপ নাই কিন্তু চিনির রূপ আছে গুণের রূপ নাই কিন্তু গুণযুক্ত বস্তুর রূপ আছে। এইরূপ শান্তি, আনন্দ, পবিত্রতা, ইত্যাদির রূপ নাই কিন্তু এই সমস্ত গুণের সাগর পরমপিতা পরমাত্মার রূপ আছে। তাঁহার নামও আছে, ধামও আছে আবার কর্তব্যও আছে।

পরমাত্মার রূপ যেমন আমাদের দেহধারীদের রূপ হইতে পৃথক, তেমনি তাঁহার নামও আমাদের নাম হইতে পৃথক। মানুষের নাম গুণ ও কর্তব্যের আধারে আরোপিত হয় না। প্রায়ই দেখা যায় মানুষের গুণ উহার নামের বিপরীত হয়। উদাহরণস্বরূপ, কাহারও নাম ধনপতি, কিন্তু দেখা যায় সে অত্যন্ত গরিব। আবার কাহারও নাম শান্তি, দেখা যায় সে অশান্তির প্রতিমূর্তি। কিন্তু পরমাত্মার নাম শিব। সকল আত্মাই তাঁহার নিকট হইতে মুক্তি, জীবন্মুক্তি, গতি-সদ্‌গতি, সুখ-শান্তি ইত্যাদি প্রার্থনা করিয়া থাকে। মানুষ পরমাত্মা শিবকে অন্য গুণবাচক নামেও স্মরণ করিয়া থাকে। ঐ সকল নামের মধ্যেও ওঁঙ্কারেশ্বর, পাপকাটেশ্বর, মুক্তেশ্বর, অমরনাথ, সোমনাথ, মহাকালেশ্বর ইত্যাদি নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরমাত্মার অথবা শিবের বিভিন্ন নাম হইতে পরমাত্মার গুণ এবং আত্মার সহিত তাঁহার সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বপন — পরমাত্মার নাম হইতে তাঁহার গুণ এবং আমাদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধের কী পরিচয় পাওয়া যায়?

ব্রহ্মাকুমারী — জগতে পিতা, শিক্ষক এবং গুরুই মানুষের সর্বাপেক্ষা শুভাকাঙ্ক্ষী ও কল্যাণকারী বলিয়া বিবেচিত হয়। পরমাত্মার নাম শিব অর্থাৎ কল্যাণকারী। তাঁহার এই নাম হইতে প্রমাণিত হয় যে তিনি সকল মনুষ্যাত্মার পরমপিতা, পরম-শিক্ষক এবং পরম-সদ্‌গুরু। কল্পান্তে তিনি ধরায় কল্যাণকারী রূপে অবতীর্ণ হইয়া জ্ঞান-দান করিয়া সকলের সদ্‌গতি করেন, অর্থাৎ তিনি শিক্ষক ও সদ্‌গুরুর কর্তব্য করিয়া

থাকেন। অপরের কল্যাণ তিনি করিতে পারেন যাহার মধ্যে কল্যাণ ভাব বর্তমান। কল্যাণ করিতে হইলে জ্ঞানের প্রয়োজন, কারণ মানুষ অজ্ঞানতাবশতঃ বিকর্ম করিয়া থাকে, আর তাহার ফলেই অকল্যাণ হয়। অতএব পরমাত্মার কল্যাণকারী নাম হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে তিনি জ্ঞানের সাগর, সদা পাবন, সদা মুক্ত এবং সর্বশক্তিমান। অতএব পরমাত্মার নাম অতীব মহান। অতীব মহান তিনি, সাধারণ নাম হইতে ভিন্ন। বস্তুতপক্ষে পরমাত্মা নাম হইতে ভিন্ন নন, পক্ষান্তরে তাঁহার নাম আমাদের নাম হইতে স্বতন্ত্র।

পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ দ্বারা অপার আনন্দ-লাভ

পরমাত্মার সহিত আমাদের অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ। কিন্তু মানুষ আজ এই সম্বন্ধের কথা স্মরণ করে না। সাধারণতঃ ধনীর পুত্রের মনে এইরূপ একটা বোধ থাকে যে সে ধনীর পুত্র! কিন্তু যদি তাহার মধ্যে সেইরূপ ভাব না দেখা যায় এবং দেখা যায় যে সে অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া আছে, তাহা হইলে মনে এইরূপ চিন্তা বা ভাবনা আসিবে যে উহার পিতা একজন ধনী ব্যক্তি হইলে কী হইবে, উহার পিতার সহিত উহার কোন সম্বন্ধ হয়তো নাই। আপনারাও সেই সর্বশক্তিমান পরিমপিতা পরমাত্মার সন্তান, কিন্তু আপনাদের মনে সেই পবিত্র খুশির নেশা কোথায়? আপনাদের বর্তমান-দুঃখী, অশান্তিপূর্ণ জীবন দেখিয়া ইহাই প্রতীয়মান হয় যে জ্ঞান ও শান্তির সাগর, দুঃখহর্তা, সুখদাতা, পতিত-পাবন, পরমপিতা, পরমাত্মার সহিত আপনাদের কোন সম্বন্ধ নাই।

পরমাত্মার নিবাস ব্রহ্মলোক অথবা পরলোক

মানুষের বিশ্বাস সংসার মুসাফিরখানা। অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে আত্মাগণ অন্য কোন স্থান হইতে এই মুসাফিরখানা রূপ সংসারে আসিয়াছে। ঐ স্থানকেই পরমধাম বা ব্রহ্মলোক বলা হয়। সুতরাং আত্মাগণের আলয় যেখানে হইবে, পরমাত্মারও আলয় সেখানেই হইবে। ইহলোকে পিতা যে গ্রামের অধিবাসী হয়, পুত্রও সেই গ্রামেরই অধিবাসী হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে পরমপিতা পরমাত্মা শিবও

ব্রহ্মলোক নিবাসী। ধর্মগ্লানির সময় তিনি এই মনুষ্য সৃষ্টিতে অবতরণ করেন এবং মনুষ্যাত্মাদিগকে ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও রাজযোগ শিক্ষা দেন।

স্বপন — আপনার ব্যাখ্যা শুনিয়া মনে হইতেছে যে পরমাত্মা সত্যি আমাদের পরমপিতা এবং তাঁহার নিজস্ব স্থান বা আলয় আছে। কিন্তু আমি ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে মানুষ যাহার উপর ভিত্তি করিয়া পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলিয়া আসিতেছে, উহার কোনো রূপ নাই! যেমন সুখ-দুঃখ, শীত-গ্রীষ্ম, বায়ু প্রবাহ ইত্যাদির অনুভব হয়, কিন্তু উহাদের কোন রূপ চোখে পড়ে না; তেমনই পরমাত্মাকেও অনুভব করা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার কোন রূপ নাই। তাঁহাকে কেহই দেখে নাই!

ব্রহ্মাকুমারী — পরমাত্মাকে যদি কেহ দেখিয়া না থাকে, তবে তাঁহার পার্থিব স্মারক বা স্মৃতি চিহ্ন শিবলিঙ্গ কীরূপে আসিল? যদি তাঁহাকে দেখাই না যায়, তবে তাঁহাকে সাক্ষাৎকার করিবার জন্য লোক কামনা করে কেন? আবার কেহ যদি না দেখিয়া থাকে, তবে তাঁহাকে জ্যোতিস্বরূপ বা জ্যোতির্লিঙ্গম কী করিয়া বলা হইয়াছে, গীতায় তাঁহাকে অব্যক্ত মূর্ত প্রকাশময় দিব্যরূপ বলা হইয়াছে কেন? অতএব ইহা স্পষ্ট যে পরমাত্মার রূপ আছে এবং দিব্য দৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে দেখাও যাইতে পারে। পরমাত্মা দ্বারা দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হওয়াকে বরদান বিবেচনা করা হয়। আমাদের এখানে অনেকেই পরমাত্মার ঐ দিব্যরূপ সাক্ষাৎকার অথবা অনুভব করিয়াছেন।

আপনি বলিতেছেন সুখ-দুঃখের ন্যায় পরমাত্মা অনুভবযোগ্য। উহার কোন রূপ নাই। কিন্তু সুখ বা দুঃখ কোন বস্তু নহে, উহা আত্মার সাময়িক অবস্থানের প্রকাশ। অবস্থাভেদে সুখ-দুঃখ আত্মার অনুভব মাত্র। বস্তুতঃ আত্মার রূপ হইতেছে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম জ্যোতির্বিন্দু এবং পরমাত্মার রূপও জ্যোতির্বিন্দু বিশেষ। হ্যাঁ, পরমাত্মার আনন্দ, শান্তি ইত্যাদি গুণগুলির কোন রূপ নাই।

কোন কোন জিনিস অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ার জন্য আমরা সাধারণত: বলিয়া থাকি যে উহার কোন রূপ নাই। উদাহরণস্বরূপ বায়ুকে যেরূপ পাত্রে রাখা যায় উহার রূপ সেইরূপ ধারণ করে, কোন ফুটবলের মধ্যে উহাকে রাখিলে উহা ফুটবলের আকার ধারণ করে। অতএব রঙ হীন সূক্ষ্ম ও চঞ্চল বায়ুকে রূপহীন বলিলে ভুল করা হইবে। বস্তুতঃ বায়ুর রূপ আছে কিন্তু স্থূল চক্ষুর দ্বারা উহার সূক্ষ্মরূপ দেখা যায় না। **পরমাত্মাও অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ার জন্য স্থূল চক্ষুর দ্বারা তাঁহাকে দেখা যায় না। তাঁহাকে দর্শন করিতে হইলে দিব্য দৃষ্টির প্রয়োজন।**

স্বপন — কিন্তু দিদি, সসীমের মধ্যে অসীম বা অনন্তের জ্ঞান হইতে পারে না। অনন্তের জ্ঞান যাহার মধ্যে নাই সে পরমাত্মা নয়!

ব্রহ্মাকুমারী — সর্বজ্ঞ বা অনন্তের জ্ঞান থাকিতে হইলে সর্বত্র বা অনন্ত পরিব্যাপ্ত হইতে হইবে ইহা অযৌক্তিক। আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিকগণ, জ্ঞানবলে বহির্বিশ্বের অনেক কিছুই ঘরে বসিয়া জানিতে পারেন। ঘরে বসিয়া চন্দ্রে ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণ করিতে পারেন। সুতরাং যিনি সকল বিজ্ঞানীদের পিতা সেই সর্বশক্তিমান পরমবিজ্ঞানীর পক্ষে ব্রহ্মলোকে থাকিয়া সর্বজ্ঞ হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

স্বপন — পরমাত্মা সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কেমন করিয়া করেন?

ব্রহ্মাকুমারী — আপন আপন সংস্কার ও ভাবের বশবর্তী কোন কোন দেহাভিমানী বিজ্ঞানী সৃষ্টির অন্তে ব্রহ্মাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, মুসল অর্থাৎ পারমানবিক অস্ত্র শস্ত্র ইত্যাদি তৈয়ারি করে এবং তাহার প্রয়োগে মহাবিনাশ সংঘটিত হয়। ভারতবর্ষে আসুরী স্বভাবযুক্ত লোকেরা ঐ সময় ভাষাভেদ, ধর্মভেদ, নীতিভেদ, ইত্যাদির আধারে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া মহাবিনাশে সহায়তা করে। মারণাস্ত্র প্রয়োগের ফলে প্রকৃতির মধ্যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ফলে প্রকৃতিও বিরূপ হয়। লোকে কিন্তু মহাবিনাশ বলিতে এইরূপ মনে করে যে পরমাত্মা হয়ত সম্পূর্ণ বিনাশ সাধন

করিয়া থাকেন যাহাতে সমস্ত প্রকৃতি অণু পরমাণু রূপ ধারণ করে। কিন্তু তাহাদের ঐরূপ ধারণা ভুল। কারণ এই সৃষ্টি অনাদি এবং ইহা পরিবর্তিত হয়। ইহার সম্পূর্ণ বিনাশ ও পরমাণুতে পরিবর্তন কদাপি হয় না।

অতএব সৃষ্টি যখন পরমাণুতে পরিবর্তিত হয় না তখন ইহাকে পুনরায় সৃষ্টি বা তৈয়ারি করিবার প্রয়োজন হয় না। কেবল অধর্মের বিনাশ করিয়া সৎধর্মের স্থাপন করিবার অর্থাৎ তমোপ্রধানতা দূর করিয়া স্বতঃ প্রধান সৃষ্টির স্থাপন করিবার আবশ্যক হয়। পরমপিতা পরমাত্মা শিব প্রজাপিতা ব্রহ্মার শরীরে দিব্য অবতরণ করিয়া তাঁহার মুখকমল দ্বারা জ্ঞান ও যোগ শিক্ষা দিয়া সত্ত্বগুণী সৃষ্টির স্থাপন করেন।

পরমাত্মা কি সর্বব্যাপী ?

স্বপন — দিদি, প্রায় সকল শাস্ত্রেই পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মাকুমারী — মনুষ্য মতের উপর আধারিত শাস্ত্রে পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলা হইয়াছে। কিন্তু সর্বশাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবদগীতা প্রমাণ করে যে পরমাত্মা সর্বব্যাপী নন। গীতা শাস্ত্র স্বয়ং ভগবানের মহাবাক্য হইতে সৃজিত। সুতরাং ভগবান নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা স্বীকার করা অবশ্য কর্তব্য। ভগবান বলিয়াছেন—"হে বৎস, আমার স্বরূপ তোমরা আমার দ্বারা জান।" যদি মানুষ ভগবানের স্বরূপ জানিত, তবে বেদ্ শাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও ভগবানকে অবতীর্ণ কেন হইতে হয়, আর তিনিই বা কেন বলেন—"এই যোগ এবং জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য আমাকে আবার ইহা শুনাইতে আসিতে হইয়াছে।" অতএব ইহা নিশ্চিত করে বেদ্, উপনিষদ্ ইত্যাদি হওয়া সত্ত্বেও ভগবানের সত্যজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

স্বপন — গীতার দ্বারা কেমন করিয়া প্রমাণ হয় যে ভগবান সর্বব্যাপী নন ?

ব্রহ্মাকুমারী — গীতায় আছে পরমপিতা অবতীর্ণ হন। যদি পরমাত্মা সর্বব্যাপী হন

তবে তাঁহার অবতীর্ণ হইবার প্রশ্নই ওঠে না। অতএব গীতার অবতারবাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইহা সুস্পষ্ট যে পরমাত্মা সর্বব্যাপী নন। বস্তুতঃ গীতায় এই মহাবাক্যও আছে যে "এই সৃষ্টির অব্যক্ত আকাশ তত্ত্বের পরে যে অব্যক্তধাম আছে, যেখানে সূর্য ও তারাগণের প্রকাশ পর্যন্ত পৌঁছায় না উহাই আমার পরমধাম।" ভগবান ইহাও বলিয়াছেন যে "আমি প্রবেশ যোগ্য। আমি দিব্য জন্মগ্রহণ করি। সাধারণ শরীরে, সাধারণ বেশে অবতীর্ণ হওয়ায় আমায় অনেক মূঢ়মতি মনুষ্য চিনিতে পারে না।" এই সৃষ্টি একটি বিপরীত মুখী বৃক্ষ বিশেষ। আমি ইহার অবিনাশী বীজ স্বরূপ, আমি সূর্য ও নক্ষত্রের প্রকাশ লোকেরও পরপারে ব্রহ্মযোনিতে থাকি।

স্বপন — কিন্তু দিদি, গীতার কোন কোন মহাবাক্যে পরমাত্মার সর্বব্যাপীত্বও সূচীত হয়।

ব্রহ্মাকুমারী — উহা ভগবানের মহাবাক্য নহে। কিছু কিছু মনুষ্য মত উহাতে পরে সংযোজিত হইয়াছে। কারণ ঈশ্বর স্বয়ং গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের ৬ নং শ্লোকে এবং চতুর্থ অধ্যায়ের ৭ ও ৮ নং শ্লোকে তাঁর নিবাসস্থল এবং ধরায় আগমন উপলক্ষ্যে যে মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা তাঁহার সর্বব্যাপীত্বের পরিপন্থী। তিনি যদি সর্বব্যাপী হইতেন তাহা হইলে তাঁহার নিবাসস্থানের প্রয়োজন কোথায় ? আর তাঁহার ধরায় আগমনের প্রয়োজনই বা কী ? **তিনি যদি সর্বজীবে, সর্বভূতে বিরাজমান হইতেন, তাহা হইলে সকলের মধ্যে তাঁহার গুণ প্রতিভাত হইত। বাস্তবে আমরা কিন্তু সেইরকম দেখিতে পাই না। তাই সর্বব্যাপীত্বের ধারণা ঈশ্বর প্রদত্ত মহাবাক্য নয়, উহা পরে মনুষ্য কর্তৃক সংযোজিত হইয়াছে।**

স্বপন — হ্যাঁ, মনুস্মৃতিতে এইরূপ কথিত আছে যে কোন বিষয়ে শাস্ত্রে দুই প্রকারের মতবাদ থাকিলে, অথবা দুইজন পণ্ডিত উক্ত বিষয়ে দুই প্রকারের মত পোষণ করিলে, বিবেক দ্বারা উহার সত্যাসত্য পরীক্ষণীয়। ইহা ছাড়া আর্য-সমাজের ভাইগণও গীতাকে সামঞ্জস্যহীন বলিয়া মনে করেন। অনেকে বলেন, গীতায় একাধিক অধ্যায়ে একই

শ্লোকের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মূল গীতার শ্লোক অনেক কম ছিল। এইসব বিবেচনা করিলে ইহা স্বতঃই মনে হয়ে যে কিছু কিছু স্ববিরোধী শ্লোক মনুষ্য দ্বারা পরে গীতায় সংযোজিত হইয়াছে।

ব্রহ্মাকুমারী — প্রকৃতপক্ষে ইহা উপলব্ধির বিষয়, তর্ক-বিতর্কের বিষয় নহে। আমাদের মধ্যে বহু ব্রহ্মাবৎসেরই পরমপিতা পরমাত্মার দিব্য জ্যোতির্বিন্দু রূপ প্রায়ই সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। আমরা বহু বারই ব্রহ্মলোকেরও দিব্য সাক্ষাৎকার করিয়াছি। পরমাত্মা আমাদের সকলেরই পরমপিতা, পরমশিক্ষক এবং পরম সৎগুরু। অতএব পিতা আপন পুত্রের অথবা শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে বিদ্যমান হইতে পারে কি? পরমপ্রিয়, পরমপিতা, পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বিবেচনা করা বিপরীত বুদ্ধির পরিচায়ক। কিন্তু আশ্চর্য, মানুষ আজ ইহাই শ্রেষ্ঠ দর্শন বলিয়া গণ্য করে। যখন মনুষ্যাত্মা মুক্তি পাইয়া ব্রহ্মলোকে যাইবার জন্য প্রয়াস করে, তখন সদা-মুক্ত পরমাত্মা এই সংসার বন্ধনের মধ্যে কেমন করিয়া বিদ্যমান থাকিতে পারেন? যখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর এই সংসারের পাঁচতত্ত্বের ঊর্ধ্বে আপন আপন দেবপুরীতে বাস করেন, তখন তাঁহাদের রচয়িতা পরমপিতা পরমাত্মা শিব, মানুষ যাঁহাকে ঊর্ধ্বে অবস্থিত জ্ঞানে স্মরণ করে, তিনি কেমন করিয়া এই সংসারে আবদ্ধ হইবেন?

হ্যাঁ, যেমন কোন প্রেমিকার চক্ষে প্রেমিক সর্বত্র দৃশ্যমান হয়, অথবা যেমন প্রেমে বিভোর মীরা গিরিধারী লালকে সর্বত্র দেখিতে পাইতেন তেমনই ভক্ত প্রেমে বিভোর হইয়া বলে—'আমি তো পরমাত্মাকে সর্বত্র দেখিতে পাইতেছি'।

কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে পরমাত্মা সর্বত্র বিরাজমান, পক্ষান্তরে পরমপ্রিয়, পরমপিতা পরমাত্মা পরমধাম নিবাসী। তন্ময় হইয়া তাঁহাকে স্মরণ করিলে তিনি ভক্তের মনোকামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত যে কোন স্থানে ভাবনা অনুযায়ী সাক্ষাৎকার করাইতে পারেন। অতএব প্রেমিকের ন্যায় আপনিও পরমাত্মার অনুভব যে কোন

সকল আত্মার পিতা পরমাত্মা

পরমাত্মা শিব, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামেরও পরমপূজ্য। মক্কার 'সঙ্গ এ অস্‌বদ্' ও বৌদ্ধদের সাধনার মাধ্যম অনুরূপ পাথর ও পরমাত্মা শিবেরই সৃষ্টি চিহ্ন বিশেষ। যীশুখ্রীষ্ট এবং গুরুনানকও পরমাত্মাকে জ্যোতিস্বরূপ এবং অশরীরী আখ্যা দিয়াছেন। অতএব নিরাকার পরমাত্মা শিবই সকলের পিতা।

ভারতবর্ষের উত্থান-পতনের ৮৪ জন্মের কাহিনি

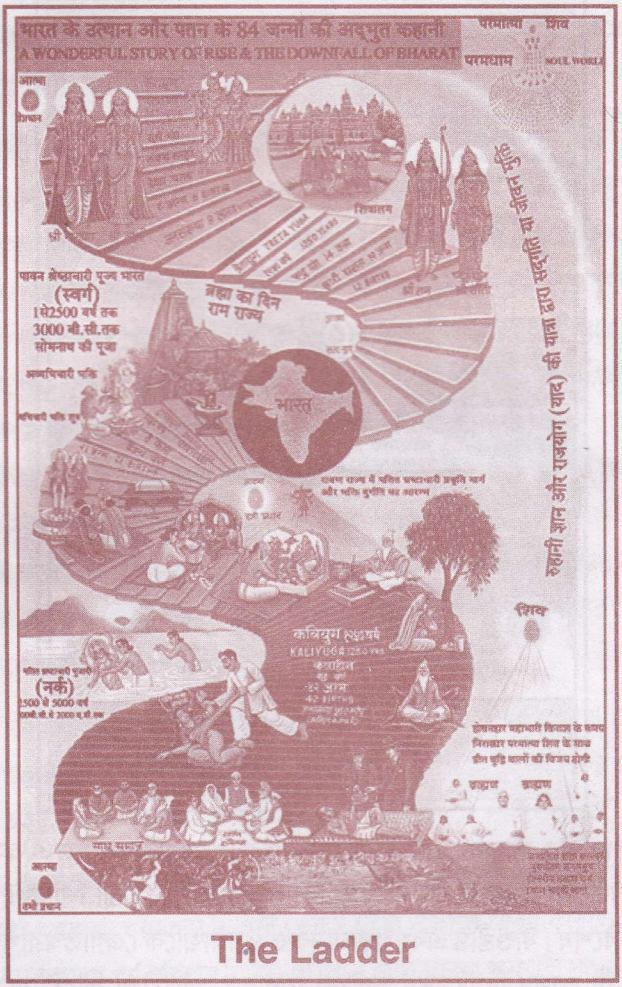

৮৪ জন্মের উত্থান-পতনের অদ্ভুত কাহিনি

স্থানে করিতে পারেন কিন্তু পরমাত্মা সর্বত্র বিদ্যমান নহে। ঘরে-ঘরে পরমাত্মা বিরাজিত নহে, তবে তাঁহার প্রতিমা বা স্মরণ ঘরে-ঘরে হইতে পারে।

স্বপন — আপনার বক্তব্য যুক্তিপূর্ণ, কিন্তু মানুষ যে বলে পরমাত্মা কোণে কোণে বিরাজমান!

ব্রহ্মাকুমারী — পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলার অর্থ পরমাত্মাকে অপমান করা। কারণ পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলিয়া মান্য করিলে ইতর বা নিকৃষ্ট যোনি যথা বৃশ্চিক, সর্প, মৎস্য, কুকুর, উল্লুক, ভল্লুক, ব্যাঘ্র, সিংহ, বরাহ ইত্যাদি এবং বৃক্ষ-লতা, আকাশ-বাতাস সর্বত্রই তাঁহাকে বিদ্যমান মানিতে হয়। ইহা জড়-সমন্বয়বাদ হইয়া গেল, পরমপুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য রইল কোথায়? ইহা ছাড়া আপনার মহান পিতার সম্বন্ধে এইরূপ বলা বা এইরূপ ধারণা পোষণ করা মূর্খতার পরিচায়ক। যে প্রস্তরকে মানুষ পদদলিত করে, যে ধূলিকণা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেয়, বিষ্ঠাকে মানুষ ঘৃণা করে, যে হিংস্র প্রাণীকে মানুষ স্বপ্নেও দেখিতে চায় না, তাহার মধ্যে ভগবানকে বিরাজিত বলিয়া গণ্য করা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় নয় কি?

যিনি মুক্তি এবং জীবন্মুক্তি দাতা, সর্ব-দুঃখ-ভয়-ব্যথা হরণ করেন এবং জ্ঞানের সাগর, গুণের সাগর, আনন্দের সাগর সেই পরমপ্রিয়, পতিত পাবন, পরমাত্মাকে ইতর যোনির মধ্যে বর্তমান বলার অর্থ তাঁহার গ্লানি করিয়া পাপভাগী হওয়া এবং তাঁহার প্রকৃত পরিচয় হইতে বিমুখ হওয়া।

স্বপন — শ্রদ্ধেয়া দিদি, এখন আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী

বলার অর্থ আপন প্রিয় পিতার গ্লানি করা।

প্রশ্ন

১) পরমাত্মার দিব্য নাম, দিব্য রূপ এবং দিব্য ধাম-সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

২) পরমাত্মার সহিত আমাদের সম্বন্ধ কী?

৩) পরমাত্মা যে সর্বব্যাপক নন তাহার প্রমাণগুলি কী কী?

৪) আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য কী?

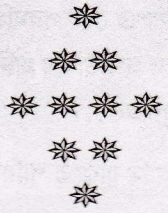

চরিত্রের নব-নির্মাণই দ্বারা সৃষ্টির রচনা
পরমাত্মার দিব্য কর্তব্য

ব্রহ্মাকুমারী — আপনি যে পরিচয় পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে আপনার লৌকিক পিতার পেশা ব্যবসা লিখিয়াছেন, কিন্তু পারলৌকিক পিতা পরমপিতা পরমাত্মার দিব্য-কর্তব্য সম্বন্ধে কি কিছু লিখিয়াছেন?

স্বপন — দিদি, আমি লিখিয়াছি যে পরমাত্মাই সব কিছু করান। প্রবাদও আছে "তোমার কর্ম তুমি করাও নাথ, মানুষের তাহাতে নাহি কোন হাত।" তাহা হইলে দিদি, মানুষ কিছুই করিতে পারে না, সে নিমিত্ত মাত্র। পরমাত্মার আদেশ ছাড়া গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়িতে পারে না। এই সবই তাঁহার রচনা, তিনিই সব কিছু করেন বা করান। ইহাই তাঁহার মহিমা!

ব্রহ্মাকুমারী — তাহা হইলে খুনী যখন খুন করে, চোর যখন চুরি করে অথবা লুণ্ঠনকারী যখন লুণ্ঠন করে, তাহাও কি পরমাত্মা করিতেছেন বা করাইতেছেন? আর এই সমস্ত কাজের দ্বারা কি পরমাত্মার মহিমা প্রমাণিত হয়? আবার যখন এই সমস্ত কার্যই পরমাত্মা করিতেছেন তখন সরকারের পক্ষে আইন প্রণয়ন, জেল সংরক্ষণ এবং বিচারালয় ইত্যাদি স্থাপনের প্রয়োজন কী? যখন পরমাত্মাই খুন করাইতেছেন এবং ডাকাতি করাইতেছেন তখন ডাকাতের দণ্ডই বা কেন আর খুনীকেই বা ফাঁসিতে ঝুলাইতে হইবে-বা কেন? পরমাত্মার মহানতা বলিতে কি ইহাই বুঝিয়াছেন যে পরমাত্মা বসিয়া বসিয়া বৃক্ষের পাতা দুলাইতেছেন? পরমাত্মা যখন সর্বমহান তখন তাঁহার কর্তব্য কর্ম মহান হওয়া উচিত না চুরি, ছিনতাই ডাকাতি ইত্যাদি করানো এবং বৃক্ষের পাতা নাড়ানো তাঁহার কর্তব্য কর্ম হওয়া উচিত? ভগবান বলিয়াছেন আমার কর্তব্য দিব্য। ভগবানের নামই শিব অর্থাৎ কল্যাণকারী।

স্বপন — দিদি, চুরি-ডাকাতি-খুন ইত্যাদি পরমাত্মার কর্ম হইতে পারে না, আর বৃক্ষের পাতা নাড়ানোরও তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই কারণ বৃক্ষের পাতা বায়ু সঞ্চালনে দুলিয়া থাকে। আমিও যখন এই কথা শুনিতাম যে পরমাত্মাই সব কিছু করান, তখন আমারও মনে এই প্রশ্ন উঠিত যে পরমাত্মা চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি সমস্ত অপরাধমূলক কর্ম করাইতে পারেন না। আর যদি তিনি এই সমস্ত কর্ম করান তবে অপরাধীর দণ্ড হইবে কেন? দিদি, সমস্ত কিছুই পরমাত্মা করেন না, কিন্তু পরমাত্মার বিষয়ে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে তিনি রচনা, স্থাপনা ও বিনাশ (সৃষ্টি, স্থিতি, লয়) করাইয়া থাকেন।

ব্রহ্মাকুমারী — রচনা, স্থাপনা ও বিনাশের অর্থ কী এবং পরমাত্মা এই কর্তব্য কেমন করিয়া করেন?

স্বপন — দিদি, মাতৃগর্ভে শিশু যে শরীর লাভ করে উহার সৃষ্টি বা রচনা পরমাত্মাই করেন, এবং সেই কারণে পরমাত্মাকে জন্মদাতা অথবা রচয়িতা বলা হয়। আকাশে মেঘ সৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং সূর্যের দীপ্তি ইত্যাদি সবই পরমাত্মারই কাজ। এই জন্য লোকে তাঁহার গুণগান করিতে করিতে বলে ঃ

"প্রাণাকরে দাও আলো, স্নিগ্ধ কর
ধরণীর বুক, করিয়া বর্ষণ।
সকলের দাতা হে জগদীশ্বর,
নিজ হস্তে করিয়াছ এ বিশ্ব সৃজন"

এই বিশ্ব সংসার তিনি রচনা করিয়াছেন। পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, বৃক্ষ-লতা ইত্যাদি সমস্তই তাঁহার রচিত কার্য।

ব্রহ্মাকুমারী — বিবেচনা করিয়া দেখুন আপনার বিবেক কী বলে। শিশু তো কাম বিকার হইতে জন্ম লাভ করে। শিশুর শরীর মাতা-পিতার কাম-বিকার হইতে উৎপত্তি হয়। এই কাম-বিকারের ভয়ে সাধু সন্ন্যাসী গৃহত্যাগ করিয়া বনবাসী হয়

এবং মানুষকে ব্রহ্মচর্য পালনে উপদেশ দেয়। ভগবানের নিকট লোকে প্রার্থনা করে—"আমার বিষয় বিকার ঘুচাও প্রভু।" শিশু জন্মাইবার সময় গর্ভধারী মাতার ক্লেশ হইয়া থাকে, কিন্তু ভগবানকে দুঃখহর্তা, সুখকর্তা বলা হয়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আপনিই বলুন, শিশুর জন্ম ভগবান দেন কিনা? শিশুর জন্ম দেয় তাহার মাতা-পিতা। ভগবান এইরূপ বিকার-যুক্ত জন্ম দেন না, ভগবানের কর্তব্য যখন উচ্চ, সুখদায়ক এবং মহিমা-যোগ্য তখন অবশ্যই তিনি অন্য কোন প্রকারে জন্ম দেন। সেইরূপ আকাশে মেঘ ভগবান সৃষ্টি করেন না। সূর্যকিরণে সাগর বা নদীর জল বাষ্প হইয়া আকাশে উঠিয়া যায় এবং পরে ঘনীভূত হইয়া মেঘে পরিণত হয়। ইহা প্রকৃতির কার্য। প্রকৃতির কার্যকে পরমাত্মার কার্য বলিয়া গণ্য করিলে ভুল হইবে। বর্ষার জল পাহাড় পর্বত হইতে নামিয়া আসিবার ফলে নদীর সৃষ্টি হয়। এই নদী কখনও কখনও পথ পরিবর্তন করিবার ফলে জল-প্লাবিত হইয়া বহু গ্রাম ধ্বংস হইয়া যায়। তাহা হইলে এইরূপ বলা কি সমীচীন যে পরম কল্যাণকারী পিতা পরমাত্মা-নদী-নালা সৃষ্টি করেন? ঐরূপ আপন কক্ষে সূর্যের চারিপার্শ্বে পৃথিবীর আবর্তনের ফলে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ দিন বা রাত্রি হইয়া থাকে। ইহা সমস্তই প্রাকৃতিক কার্য। প্রাকৃতিক আকর্ষণ বিকর্ষণকে পরমাত্মার কার্য বলিয়া গণ্য করিলে পরমাত্মা ও প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য জানা যায় না। সুতরাং প্রকৃতির কার্যগুলিকে পরমাত্মার কার্য বলিয়া গণ্য করিলে পরমাত্মা ও প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য জানা যায় না। সুতরাং **প্রকৃতির কার্যগুলিকে পরমাত্মার কার্য বলিয়া গণ্য করায় বহু মানুষ নাস্তিক হইয়া গিয়াছে।** বিজ্ঞান দ্বারা প্রাকৃতিক শক্তি বা কার্যগুলি জানা যায়, ভগবানকে জানা যায় না।

এই সৃষ্টি কি ভগবান রচনা করিয়াছেন?

ভাবিয়া দেখুন, পরমাত্মা নিরাকার। তাঁহার হাত-পা নাই। ইন্দ্রিয় অর্থাৎ স্থূল সাধন ছাড়া কোন সাকার বস্তু সৃষ্টিই করা যায় না! তাহা হইলে কেমন করিয়া বলা যায় যে নিরাকার পরমাত্মা সাকার সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন। এই সৃষ্টি পরমাত্মার

রচিত হইতে পারে না কারণ তাঁহার কোন শরীর নাই। ধরুন, পরমাত্মা প্রথমে নিজের শরীর সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পরে এই সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন। তাহা হইলেও যুক্তি ঠিক হয় না, কারণ সাকার শরীর সৃষ্টির জন্য সাকার সাধন চাই। সুতরাং নিশ্চিত হন যে **এই সৃষ্টি অনাদি এবং প্রকৃতিও পুরুষের খেলা**। প্রকৃতির আপন শক্তি ও কার্য আছে, কিন্তু পরমাত্মার কার্য হইতে উহা স্বতন্ত্র। তিনিও রচয়িতা, কিন্তু যে অর্থে আপনি বলিতেছেন সেই অর্থে নহে। পরমাত্মা দ্বারা স্থাপন ও পালনের দিব্য কর্তব্যের অর্থ ভিন্ন।

স্বপন — দিদি, ভগবানই তো সকলকে লালন পালন করেন। আমরা যে অন্ন-ধন পাই তাহাও তিনি দেন। তিনিই আমাদিগকে এই জল ও বায়ু দান করিয়াছেন, আর সংহারের অর্থ হইতেছে যে মৃত্যুও তাহাও তাঁহারই হাতে। এই কারণে যখন কাহারও মৃত্যু হয়, লোকে বলে—'ইহাই বিধির বিধান।' কেউ কেউ রোদন করিতে করিতে বলে—'ঈশ্বর অন্যায় করিয়া আমার সন্তানকে ছিনাইয়া লইলেন।' প্রকৃত সত্য কী তাহা আপনিই বলুন।

পরমাত্মাই কি সকলের অন্ন যোগান?

ব্রহ্মাকুমারী — কোন ব্যক্তি সমস্ত দিন পরিশ্রম শেষে চার টাকা রোজগার করিয়া আপনার এবং সন্তান-সন্ততিদিগের ভরণ-পোষণ করিতে দেখিয়া আপনি কি ইহাই বলিবেন যে পরমাত্মা উহার এবং উহার সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ করিতেছেন? আজ সংসারে লক্ষ-লক্ষ লোকের পেট ভরা অন্ন নাই, শরীরের ন্যূনতম বস্ত্র নাই। ইহাই কি পরমাত্মার সংসার পালনের নমুনা! না, না! এই সংসারে মানুষ যেরূপ কর্ম করে, সেইরূপ তাহাকে ফল ভোগ করিতে হয়। কেহ বা নির্ধন পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, আবার কেহ বা ধনবান পরিবারে—এই ভেদ পূর্বজন্মের কর্মের ফল; ইহাতে পরমাত্মার কোন হাত নাই। এইরূপ জল বায়ু ইত্যাদি পাঁচতত্ত্ব অনাদি। বৈজ্ঞানিকরাও এই কথা বলেন যে প্রকৃতি অনাদি, উহাকে সৃষ্টি করিতে পারা যায় না এবং উহার বিনাশও সম্ভব নয়; উহার রূপান্তর হইতে পারে। সুতরাং পরমাত্মাকে

এই অর্থে দাতা বা পালনকর্তা বলা যায় না যে তিনি আমাদিগকে মুক্ত হস্তে জল-বায়ু দান করিয়াছেন; তবে তিনি এমন বরদান দেন যাহা ছাড়া মানুষের সুখ-শান্তি হইতেই পারে না। জল-বায়ু কখনও কখনও ঝড় বা বন্যা রূপে মানুষের কাছে দুঃখের কারণ রূপে উপস্থিত হয়।

পরমাত্মা কি মনুষ্যের মৃত্যুর কারণ ?

কাহারও রোগভোগে মৃত্যু হইলে এই কথা বলা যায় না যে পরমাত্মা উহাকে সংহার করিয়াছেন। অথবা কোন ব্যক্তি অপরকে হত্যা করিলে এইরূপ বলা অনুচিত যে পরমাত্মা উহাকে হত্যা করিয়াছেন। বরং ইহাই যুক্তি-যুক্ত যে উহাদের কর্মফল অনুযায়ী উহাদের দেহের বিনাশ হওয়ায় আত্মার ভোগকাল সমাপ্ত হইয়াছে।

অতএব ইহা পরিষ্কার যে পরমাত্মার কর্তব্য যথা স্থাপন,পালন ও বিনাশ অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, লয় নামে যে প্রসিদ্ধি চলিয়া আসিতেছে, উহা প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন, তথা উচ্চ এবং দিব্য। পরমাত্মাকে কল্যাণকারী বলা হয়। সুতরাং তাঁহার কর্তব্য দ্বারা বিশ্বের কল্যাণ সাধিত হয়।

স্বপন — দিদি আপনার যুক্তিগুলি যথার্থ বোধ হইতেছে। এখন পরমাত্মার দিব্য কর্তব্যের কিছু পরিচয় দিন।

সৃষ্টির চক্রের আবর্তন

ব্রহ্মাকুমারী — পরমাত্মার দিব্য কর্তব্যের সহিত পরিচিত হইবার পূর্বে সৃষ্টি-চক্রের মর্ম অবধান করুন; কারণ পরমাত্মার কর্তব্য সৃষ্টি চক্রের সহিত ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত। আপনি হয়ত স্বস্তিকা চিহ্ন দেখিয়া থাকিবেন। যে কোন শুভকার্যের সময় স্বস্তিকা চিহ্ন ব্যবহার করিবার পদ্ধতি আমাদের দেশে বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ বা মহত্ত্ব কেহ জানে না। এই স্বস্তিকা চিহ্নই চারি যুগের (অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি) সূচক। ইহাকে সৃষ্টি-চক্র বলা হইতেছে কারণ

চারটি যুগ চক্রাকারে আবর্তিত হয়। প্রত্যেক যুগের মেয়াদ ১২৫০ বৎসর। সুতরাং সমস্ত সৃষ্টি-চক্রের আবর্তন একত্রে ৫০০০ বৎসর। প্রতি ৫০০০ বৎসর পর সৃষ্টির ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বৃত্তান্ত সকল পুনরাবৃত্ত হইয়া থাকে। সত্য যুগে দেবী-দেবতার রাজ্য হয়। মানবের জীবন ষোল কলাপূর্ণ,সম্পূর্ণ নির্বিকারী, মর্যাদা পুরুষোত্তম। যথা রাজা-রানি তথা প্রজা। অশান্তির লেশমাত্র থাকে না। মানুষের ন্যায় জীব-জন্তু এবং প্রকৃতিও সতোপ্রধানগুণ বিশিষ্ট হয়। শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীনারায়ণ সত্যযুগে বিশ্ব মহারাজা ও বিশ্ব মহারানি রূপে অধিষ্ঠিত। ঐ যুগে সূর্য বংশীয় রাজারা রাজত্ব করেন।

ইহার পর ত্রেতা যুগ। ত্রেতা যুগে মানুষের আত্মা চৌদ্দকলা সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট। প্রকৃতিও অনুরূপভাবে সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট হয়। এই যুগেও প্রার্থিত সুখ-শান্তি বিরাজ করে। শ্রীরাম ও শ্রীসীতা এই যুগে রাজত্ব করেন। চন্দ্রবংশী রাজারা এই সময়ে রাজত্ব করিয়া থাকেন। ত্রেতা যুগের অবসানে ২৫০০ বৎসর যাবৎ দেবী দেবতার রাজত্ব শেষে দৈবী যুগের অবসান ঘটে।

তাহার পর আসে দ্বাপর যুগ। সত্যযুগ ও ত্রেতাযুগের সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী আত্মাগণ অনেক জন্ম সুখ ভোগ করিবার পর ক্রমশ বিকার যুক্ত জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করে।

ফলে মানুষের আত্মা ও প্রকৃতি উভয়েই রজঃগুণী হইয়া পড়ে। মনুষ্য তথা সমাজ জীবনে যুদ্ধবিগ্রহ, কলহ-অশান্তি প্রভৃতি দুঃখের সূত্রপাত হয়। ক্রমে বিভিন্ন ধর্মের উন্মেষ ঘটে, যথা ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, ইসাই ধর্ম ইত্যাদি। পরে অপরাপর অনেক ধর্মমত্ প্রচারিত হয়। অনেক ধর্মমত্ হওয়ার ফলে মত-ভেদ, কলহ-ক্লেশ, লড়াই-দাঙ্গা ইত্যাদি শুরু হয়; আর কাম ক্রোধাদি বিকারের প্রাবল্য হেতু মানুষের অশান্তি দিনে দিনে বাড়িতে থাকে। দ্বাপর যুগ যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য প্রসিদ্ধ। দ্বাপর শেষ হওয়ার পর কলিযুগ আসে। কলিযুগে মনুষ্যের আত্মা আরও অধিক বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং দ্বাপর যুগে যে দুঃখ ও অশান্তি শুরু হয় তাহা ক্রমশঃ বর্ধিতহইয়া

কলিযুগের অন্তে চরমতম রূপ ধারণ করে।

কলিযুগের শেষে অধর্ম বিনাশ করিয়া সত্যযুগ পুনরায় স্থাপন করিবার তথা মানুষকে দেবতায় পরিণত করিবার জন্য পরমাত্মাকে তাঁহার কর্তব্য করিতে হয়। পরমাত্মা তাঁহার কর্তব্য করিবার জন্য প্রজাপিতা ব্রহ্মার শরীরে অবতীর্ণ হন। তাঁহার মুখকমলদ্বারা ঈশ্বরীয় জ্ঞান তথা প্রায়ঃ লুপ্ত সহজ রাজযোগ শিক্ষা দিয়া মানুষের তুচ্ছ বিকারী জীবনকে পবিত্র দিব্যগুণ সম্পন্ন জীবনে রূপান্তরিত করিয়া দেন পরবর্তীকালে এই পবিত্র আত্মাগণই সত্যযুগে দেবী-দেবতা রূপে রাজত্ব করেন।

নর হইতে শ্রীনারায়ণ অথবা মানুষ হইতে দেবতায় উন্নীত করণের ঈশ্বরীয় উপায়

মানুষকে পতিত হইতে পাবন, দুঃখী হইতে সুখী অথবা নর হইতে শ্রীনারায়ণে পরিণত করিবার জন্য পরমাত্মা মানুষের বুদ্ধিকে দিব্য করেন। কারণ বুদ্ধি ভ্রষ্ট হওয়ার জন্যই মানুষ মন, বচন এবং কর্ম দ্বারা অহিত কর্ম করে ও তাহার পরিণাম স্বরূপ দুঃখ এবং অশান্তি ভোগ করে। ঈশ্বরীয় জ্ঞান এবং পরমাত্মার সহিত বুদ্ধি-যোগ স্থাপন দ্বারাই দিব্য বুদ্ধির উদয় হয়। এই কারণে তাঁহাকে দিব্যবুদ্ধি দাতা, জ্ঞান-চক্ষু বিধাতা ইত্যাদি মহিমাসূচক শব্দ দ্বারা স্মরণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা নিরাকার অর্থাৎ অশরীরী। মনুষ্যত্মা যেমন কান দ্বারা শ্রবণ করে, পরমাত্মারও তেমনি মুখেন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয় যাহাতে তিনি জ্ঞান দান করিতে পারেন। পরমাত্মা জন্ম মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ নহেন, তাঁহার কোন পিতা-মাতা নাই। তিনি কর্মের অতীত সুতরাং শিশুর ন্যায় জননীর জঠরে জন্ম লইয়া তিনি মনুষ্য দ্বারা লালিত পালিত হইবেনই বা কী করিয়া! আর উহাদের সহিত কর্ম সম্বন্ধই বা জুড়িবেন কী করিয়া?

পরমাত্মা দ্বারা তিন দেবতার রচনা
শিব ও শঙ্করের মধ্যে প্রভেদ

অতএব স্থাপন, পালন ও বিনাশ এই তিন কর্তব্য করিবার জন্য পরমাত্মা প্রথমে তিন সূক্ষ্ম দেবতা যথা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্করকে রচনা করেন। এই তিন দেবতাকে রচনা করিবার জন্য পরমাত্মাকে ত্রিমূর্তিবলা হয়। কিন্তু এই রহস্য না জানার জন্যই লোক শিব ও শঙ্করকে এক বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ শঙ্কর সূক্ষ্মদেহধারী দেবতা যাঁহাকে পরমাত্মা শিব সৃষ্টির মহাবিনাশের জন্য রচনা করেন।

স্বপন — আচ্ছা, শিব ও শঙ্কর যে পৃথক এই রহস্য আজ হৃদয়ঙ্গম হইল। পূর্বেও আমার মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইত যে শিব লিঙ্গ ও শঙ্করের পৃথক প্রতিমা কেন?

ব্রহ্মাকুমারী — শিবলিঙ্গ পরমাত্মার প্রতিমা, আর শঙ্করের মূর্তি হইতেছে তাঁহার শরীরের সূচক। আমি পূর্বেই আপনাকে বলিয়াছি যে জ্ঞান দান করিবার নিমিত্তে মুখেন্দ্রিয়ের আবশ্যক। সুতরাং পরমাত্মা শিব স্বয়ং পরমধাম হইতে অবতরণ করিয়া এক সাধারণ মনুষ্যের শরীরে প্রবেশ করেন যাহাকে পরমাত্মার দিব্য জন্ম অথবা পরকায়ায় প্রবেশ বলে। পরমাত্মা প্রকৃতির অধীন মনুষ্য সদৃশ জন্মগ্রহণ করেন না। কিন্তু প্রকৃতিকে আপনার অধীন করিয়া অলৌকিক জন্মগ্রহণ অর্থাৎ পরকায়ায় প্রবেশ করেন। প্রতিদিন পরমধাম হইতে আগমন করিয়া ঐ সাধারণ এবং বৃদ্ধ মনুষ্যের মুখ দ্বারা জ্ঞান এবং সহজ যোগ শিক্ষা দিয়া বিকারের (কাম, ক্রোধ ইত্যাদি রিপু) উপর বিজয় প্রাপ্ত করিবার তথা দিব্য গুণ ধারণ করিবার সহজ উপায় বলিয়া যান।

যে বৃদ্ধ মনুষ্যের শরীরে তিনি প্রবেশ করেন তাঁহাকে তিনি প্রজাপিতা ব্রহ্মা এই কর্তব্য-বাচক নামে ভূষিত করেন। যাহারা প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখকমল নিঃসৃত জ্ঞান শ্রবণ ও ধারণ করে তাহাদিগকে ব্রহ্মার মুখজাত সন্তান অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বা দ্বিজ বলে। দ্বিজ অর্থাৎ যাহার দ্বিতীয়বার জন্ম হইয়াছে। প্রত্যেক নর-নারীর লৌকিক

জন্ম লৌকিক মাতা-পিতার দ্বারা হইয়া থাকে। লৌকিক জন্মদাতাকে লৌকিক পিতা বলে। কিন্তু পরমাত্মার জ্ঞান শ্রবণ করিয়া মানুষের জীবনে যে বিশাল পরিবর্তন আসে তাহাও তাহার নূতন জন্মগ্রহণ বিশেষ। **যাঁহার মাধ্যমে পরমাত্মার এই জ্ঞান শ্রবণ করা হয় তিনি আমাদের অলৌকিক পিতা। অতএব প্রজাপিতা ব্রহ্মা আমাদের অলৌকিক পিতা, কারণ তাঁহার মুখকমল নিঃসৃত পরমাত্মার জ্ঞান শ্রবণে আমরা অলৌকিক জীবন প্রাপ্ত হই।** সর্বোপরি সকল আত্মার পিতা পরমাত্মার সহিত আমাদের আত্মিক পিতার সম্বন্ধ চিরকালের জন্য রহিয়াছে। তিনি আমাদের পারলৌকিক পিতা। সুতরাং আমাদের পিতা তিনজন যথা লৌকিক, অলৌকিক, পারলৌকিক।

যাহা হউক, আমি আপনাকে পরমাত্মার দিব্য কর্তব্য সম্বন্ধে বলিতেছিলাম। এখন ধরুন, দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিবার পর যখন পুনরায় সুস্থ স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়, তখন লোকে বলে—"উহার নূতন জন্ম হইয়াছে!" এই প্রকার যখন কলিযুগী বিকারী নর-নারী আপনার বিকারী, কুঅভ্যাসপূর্ণ অপবিত্র জীবন যাপন পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র জীবন যাপন করে তখন এইরূপ বলা হয় যে তাহার **'মরজীবা জন্ম'** হইয়াছে। অর্থাৎ এই জীবনেই সে তাহার পুরানো বিকারী অভ্যাসগুলি হইতে মারা গিয়াছে এবং নূতন দিব্য জীবন যাপন করিতেছে। পরমাত্মার জ্ঞান শ্রবণে এইরূপ পরিবর্তন আসে বলিয়া পরমাত্মাকে দিব্যদৃষ্টি দাতা এবং রচয়িতা বলা হয়।

আত্মা অবিনাশী। সুতরাং আত্মাকে রচনা করিবার প্রশ্নই ওঠে না। আত্মা-পরমাত্মার শাশ্বত, অবিচ্ছেদ্য পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ তো রহিয়াছেই, কিন্তু সেই মধুর সম্বন্ধ মনুষ্যাত্মা ভুলিয়া গিয়াছে। পরমাত্মার রচনার কার্য হইতেছে আত্মাকে জ্ঞান দ্বারা নূতন জীবন দান করা এবং উহাকে এই নিশ্চয়ে স্থির করা—"আমি আত্মা পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান।"—

অতএব ইহা পরিষ্কার যে জ্ঞান ও যোগ দ্বারা পরমাত্মা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাকার মাধ্যমে সত্যযুগী পবিত্র সংসার রচনার কার্য করিতেছেন। পরমাত্মার রচনা বলিতে

উহা বুঝায় না যে কোন কিছুর নূতন সৃষ্টি করা, বরঞ্চ ইহাই বুঝায় যে মনুষ্যের চারিত্রিক নব-নির্মাণ অর্থাৎ দেবী ধর্মের পুনঃ স্থাপন। বর্তমান সময়ে পরমাত্মা শিব প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ঐ কর্তব্য করিতেছেন।

পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগের মাহাত্ম্য

পরমাত্মা যে সময়ে এই দিব্য কর্তব্যের কার্য করেন সেই সময়কে **'সঙ্গম যুগ'** বলা হয়। কারণ ঐ সময় কলিযুগের শেষ ও সত্য যুগের আরম্ভের মিলন হয়। আজ মনুষ্যমাত্রই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগ সম্বন্ধে অবহিত। কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক মহত্ত্বপূর্ণ কল্যাণকারী যে যুগ, যখন পরমাত্মা এই সৃষ্টি মঞ্চে আসিয়া মনুষ্যের সহিত মিলিত হন, সেই সঙ্গমযুগকে জানে না। প্রকৃতপক্ষে এই সঙ্গম যুগের স্মরণার্থে কুম্ভের মেলা পালন করা হয়, কেন না ঐ সময় পরম পিতা পরমাত্মার সহিত মনুষ্যাত্মার মিলন হয় এবং পরমাত্মা মনুষ্যাত্মাকে দেবতায় পরিণত করিবার নিমিত্ত জ্ঞানামৃতের কুম্ভ বা কলস দান করেন। বস্তুতঃ এই সঙ্গম যুগই কল্পের অমৃতবেলা বা ব্রাহ্মমুহূর্ত, কারণ কলিযুগ রূপ রাত্রি এবং সত্যযুগ রূপ দিনের সঙ্গম সময়েই পরমাত্মা জ্ঞানামৃত পান করান এবং আত্মাগণকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবার কর্তব্য করেন। এই জন্যই তিনি সকলের সৎগুরু। তিনি সৃষ্টির আদি, মধ্য অন্তের জ্ঞান দেন। এই হিসাবে তিনি শিক্ষক।

স্বপন— দিদি, আপনি বলিতেছেন যে কল্পের মধ্যে পরমাত্মা এক বারই অবতরণ করেন তাহা হইলে প্রচলিত মতবাদ 'পরমাত্মা যুগে-যুগে অবতীর্ণ হন'—তাহা কি মিথ্যা?

ব্রহ্মাকুমারী— সত্যযুগ ও ত্রেতাযুগে সত্যধর্ম বর্তমান থাকার জন্য এই দুই যুগে পরমাত্মার আসিবার প্রয়োজন হয় না।

ধর্ম গ্লানি দ্বাপর যুগ হইতে শুরু হয়। কিন্তু তখনই যদি পরমাত্মা অবতীর্ণ হইয়া অধর্মের বিনাশ করিয়া সৎধর্মের স্থাপন করেন, তাহা হইলে দ্বাপর যুগের পরই

সত্যযুগ শুরু হইয়া যায়। কিন্তু দ্বাপর যুগের পর কলিযুগ। সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে **কলিযুগের অন্তে যখন অতি ধর্ম গ্লানি হয় এবং মনুষ্য আসুরী স্বভাবযুক্ত হইয়া পড়ে তখনই পরমাত্মা অবতীর্ণ হন।**

স্বপন — পরমপিতা পরমাত্মা অধর্ম এবং আসুরী সম্প্রদায়ের বিনাশ কেমন করিয়া করান?

ব্রহ্মাকুমারী — আণবিক বিশ্বযুদ্ধ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ভারতে পারস্পরিক গৃহযুদ্ধ ইত্যাদির দ্বারা সৃষ্টির মহাবিনাশ কল্প কল্প ধরিয়া হইয়া আসিতেছে। এখন কল্পান্তে সৃষ্টির মহাবিনাশ আসন্ন। এখন যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র উদ্ভাবন করিতে ব্যস্ত তাহারা শঙ্করের নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করিতেছে। এই মহাবিনাশের প্রয়োজন আছে, ইহা ছাড়া সংসারে সম্পূর্ণ শান্তি সম্ভব নহে। রাত্রি শেষে দিন আসে। অতএব এখন কলিযুগরূপ রাত্রি অবসানে আসন্ন মহাবিনাশের পর সত্যযুগরূপ দিন আগতপ্রায়; কলিযুগে জন বিস্ফোরণ, আর সত্যযুগে জন সংখ্যা সংকুলান মত হয়। লোকে জানে না, কলিযুগের অন্তে এই সমস্ত আত্মাগণ যায় কোথায়? বস্তুতঃ মহাবিনাশের ফলে উহারা **'পরমধামে'** প্রত্যাবর্তন করে। মাত্র ৯১৬১০৮ পবিত্র দেবদেবীর আত্মা সত্যযুগী পবিত্র সৃষ্টিতে জন্মগ্রহণ করে। ইহা ছাড়া সমস্ত আত্মাই পরমধামে অবস্থান করে। পরে আপন আপন কর্ম অনুযায়ী ঐ সমস্ত আত্মাগণ অন্যান্য যুগে ক্রমশঃ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্টির পুনঃস্থাপন ও শঙ্কর দ্বারা বিনাশ ছাড়াও পরমাত্মা বিষ্ণুর দ্বারা সত্যযুগী ও ত্রেতাযুগী সৃষ্টির পালন কার্য করিয়া থাকেন। বিষ্ণুর দ্বারা পালন কেমন করিয়া হয় তাহা জানিবার পূর্বে বিষ্ণুর চতুর্ভুজ ও তাঁহার অলঙ্কারাদি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। বিষ্ণুর চতুর্ভুজের দুইভুজ শ্রীলক্ষ্মীর এবং দুইভুজ শ্রীনারায়ণের। বিষ্ণুর হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম নামে যে অলঙ্কার বর্তমান তাহা এক একটি দৈবী গুণের প্রতীক। যথা শঙ্খ—পবিত্র বচনের, সুদর্শন-

চক্র—আত্মা, পরমাত্মা তথা সৃষ্টিচক্র জ্ঞানের, পদ্ম—পবিত্র কমল ফুলের ন্যায় সংসার জীবনের এবং গদা—পঞ্চ বিকারের উপর বিজয় প্রাপ্তির প্রতীক। বিষ্ণুর দুই মুকুট যথা প্রভাস-মণ্ডল ও স্বর্ণ-মুকুট যথাক্রমে পবিত্রতা ও ঐশ্বর্যের সূচক।

যে সকল নরনারী প্রজাপিতা ব্রহ্মাদ্বারা ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও সহজ রাজযোগ শিক্ষালাভ করে তাহারা ভবিষ্যতে সত্য ও ত্রেতা যুগে ২১ জন্ম সুখ-শান্তিপূর্ণ দেবপদ লাভ করে। বিষ্ণুর প্রতিমা লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগ্ম (Combined) প্রতিমা। বস্তুতঃ লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগের জীবনই হইতেছে বিষ্ণু দ্বারা পালন অর্থাৎ বিষ্ণুর অলঙ্কারাদি যে দৈবী গুণগুলি সূচিত করে সেই গুণগুলি ধারণ করার নামই বিষ্ণুবংশী প্রকৃত বৈষ্ণব হওয়া বা বিষ্ণুর দ্বারা পালিত হওয়া।

সৃষ্টি-চক্রের প্রতিটি খুঁটি-নাটি ঘটনা হুবহু পুনরাবৃত্ত হয়। যেমন ধরুন আজ আপনাকে যে জ্ঞানের কথা শুনাইলাম, কল্প কল্প ধরিয়া ঠিক এই একই সময় একইভাবে এইরূপ জ্ঞান শুনাইতে থাকিব।

স্বপন — ইহা বড় আশ্চর্যের কথা! দিদি, কেমন করিয়া উহা সম্ভব তাহা বলুন।

ব্রহ্মাকুমারী — আত্মারূপ অভিনেতা একই থাকে। নূতন আত্মা সৃষ্টি হয় না। প্রত্যেক আত্মা বর্তমান কল্পে যে সকল কার্য করিয়া থাকে, আগামী কল্পে সে ঐ একই কার্য করিবে, কারণ প্রত্যেক আত্মার মধ্যে জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম-সংস্কার বিদ্যমান। যেমন টেপ রেকর্ড বা গ্রামোফোনের রেকর্ডে কেনা গীত বা নাটক লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে তেমনি এই ছোট জ্যোতির্বিন্দু রূপ আত্মাতে জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম-সংস্কার লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। প্রতি পাঁচ হাজার বৎসর পর-পর এই কর্ম-সংস্কার পুনরাবৃত্ত হইয়া থাকে।

কল্পের আয়ু নির্ধারণে ভুল গণনা

স্বপন — পণ্ডিতগণ বলেন যে দ্বাপরযুগের আয়ুর কলিযুগের দুইগুণ, ত্রেতার আয়ু

কলিযুগের তিনগুণ এবং সত্যযুগের আয়ু কলিযুগের চারগুণ।

ব্রহ্মাকুমারী — ইহা ঠিক নহে, কারণ স্বস্তিকার উল্লেখ করিয়া আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে প্রত্যেক যুগের আয়ু সমান। তবে ধর্মের কলা দ্বাপরযুগে কলিযুগ হইতে দুই গুণ বেশি, এবং ত্রেতা সত্যযুগে ধর্মের কলা কলিযুগ হইতে যথাক্রমে তিন ও চারগুণ বেশি। পরমাত্মা শিবও ইহাই বলিয়াছেন যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের শেষে ইব্রাহিম যখন ইসলাম ধর্ম স্থাপন করেন তখন হইতেই দ্বাপর যুগের শুরু, আর সেই সময় হইতে আজ পর্যন্ত প্রায় ২৫০০ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। এই ২৫০০ বৎসর দুঃখের এবং ইহার পূর্বে ২৫০০ বৎসর সুখের ছিল। অতএব এই সুখ ও দুঃখের খেলা ৫০০০ বৎসরের। এই মনুষ্য সৃষ্টি অনাদি কিন্তু ইহাতে এই খেলা প্রতি ৫০০০ বৎসরে একবার পুরা হইয়া পুনরাবৃত্ত হইয়া থাকে।

স্বপন — পণ্ডিতগণ কল্পের আয়ু লক্ষ লক্ষ বৎসরেরও অধিক বলিয়া গণ্য করে।

ব্রহ্মাকুমারী — প্রত্যক্ষভাবে না মানিলেও পরোক্ষভাবে উহারাও কলিযুগের আয়ু ১২০০ বৎসর বলিয়া স্বীকার করে। কেবল হিসাবের ভুলে এই মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ, প্রথমতঃ তাঁহারা যুগের আয়ু নির্ণয় করিতে মনুষ্যের ৩৬০ বৎসরকে যুগের ১ বৎসর বলিয়া ধরে, যাহাকে তাঁহারা দিব্যবৎসর বলিয়া মানে। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা এইরূপ গণনা করে যে কলিযুগ হইতে দ্বাপর, ত্রেতা ও সত্যযুগের আয়ু যথাক্রমে দুইগুণ, তিনগুণ ও চারগুণ বেশি। উত্তরী ধ্রুব ও দক্ষিণী ধ্রুব অর্থাৎ উভয় মেরুতে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত হয় অর্থাৎ এক বৎসরে একটি পুরা দিন হয় যাহাকে দিব্য দিন বলা হয়। কিন্তু দিব্য বৎসর হয় না। কারণ বৎসর গণনা করা হয় পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমার উপর, অর্থাৎ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে পৃথিবীর যে সময় লাগে তাহার উপর। সুতরাং সেই সময়ের কোন ব্যতিক্রম হয় না। তাহা হইলে ১)

দিব্য বৎসর কী করিয়া হইবে? এতএব পণ্ডিতগণ কলিযুগের ১২০০ বৎসর আয়ুকে ৩৬০ দ্বারা গুণ করায় এবং দ্বাপর, ত্রেতা ও সত্যযুগের আয়ু কলিযুগ হইতে যথাক্রমে দুই, তিন ও চার গুণ বেশি গণনা করায় কল্পের আয়ু লক্ষ লক্ষ বৎসরের অধিক বিবেচনা করিতেছেন।

স্বপন — আমি পূর্বেও এই কথা শুনিয়াছিলাম যে শাস্ত্রে দিব্য দিনের বর্ণনা আছে, কিন্তু দিব্য বৎসরের বর্ণনা নাই।

ব্রহ্মাকুমারী — যাহা হউক, পরমপিতা পরমাত্মা শিব যে জ্ঞান দিয়াছেন, সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে কল্পের আয়ু ৫০০০ বৎসর। শাস্ত্রকারগণ ভুল করিয়া উহাকে লক্ষ লক্ষ বৎসর বলিতেছেন। আর বিবেক দ্বারা বিচার করিলে দেখা যাইবে ৫০০০ বৎসর পূর্বে মহাভারতের যুগ ছিল যখন মুসল, ব্রহ্মাস্ত্র ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়াছিল। পুনরায় ঐ সমস্ত অস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে এবং পরমাত্মাও অবতীর্ণ হইয়া গীতা জ্ঞান দিতেছেন। এখনও কি আপনি বলিবেন যে কলিযুগ শেষ হইতে অনেক দেরি আছে?

স্বপন — দিদি, আপনার বক্তব্য অত্যন্ত বিবেক সম্মত এবং হৃদয়গ্রাহী। ব্রহ্মলোক নিবাসী পরমপিতা পরমাত্মার মধুর স্মৃতিতে নিমগ্ন হইলে যখন শান্তি, শক্তি এবং আনন্দ লাভ করা যায় তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে ঐ পরিচয়ই তাঁহার সত্য পরিচয় অর্থাৎ তিনি সর্বব্যাপী নন।

ব্রহ্মাকুমারী — হ্যাঁ, ইহাই তাঁহার সত্য পরিচয়। এখন হইতে তাঁহার মধুর স্মৃতি রোমন্থনের অভ্যাস করিবেন এবং কাল নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখিয়া আনিবেন।

প্রশ্ন

বিচার, ইচ্ছা, প্রয়াস, অনুভব, স্মৃতি ও সংস্কার এই সকল আত্মারই লক্ষণ। আত্মাই সত্য অসত্যের বিচার কিংবা পুরুষার্থ অনুসারে সুখ-দুঃখের অনুভব করিয়া থাকে। সুতরাং মন ও বুদ্ধি আত্মা হইতে ভিন্ন নহে।

তিন লোক

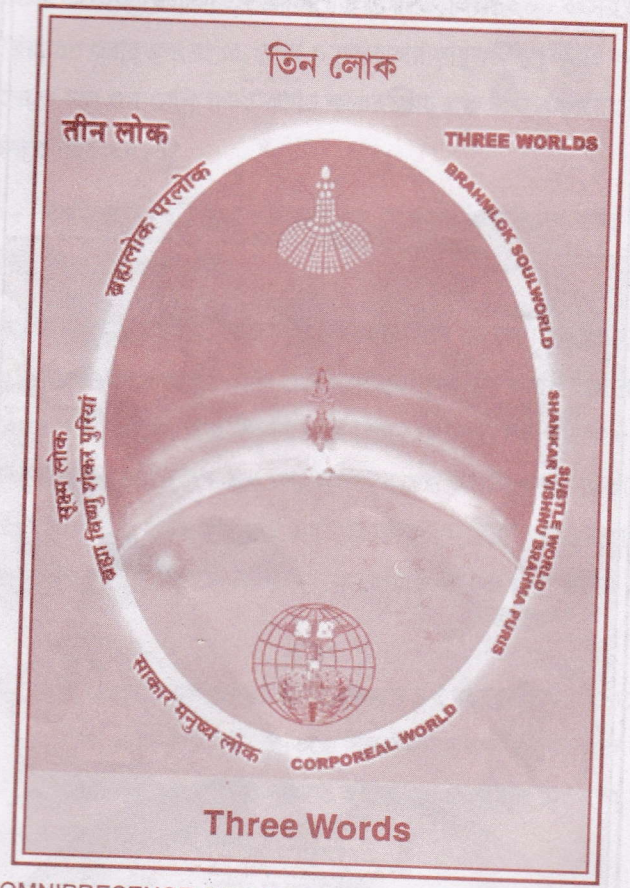

OMNIPRESENCE OF GOD IS A FEELING, NOT A FACT.

ইশ্বরের সর্বব্যাপীত্ব ভাবনা মাত্র, বাস্তব নহে।

লোক মোট তিনটি—সাকারী মনুষ্যলোক, আকারী দেবলোক এবং নিরাকারী ব্রহ্মলোক।

স্থাপন, বিনাশ এবং পালনের অর্থ কী?

২) সব কাজই কি পরমাত্মার প্রেরণায় হয়, না আত্মা আপন কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করে?

৩) পরমাত্মা সর্বব্যাপী নয় — ইহা যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া বলুন।

৪) শিব ও শঙ্করের মধ্যে পার্থক্য কী?

৫) সৃষ্টি-চক্রের আবর্তন সম্বন্ধে বুঝাইয়া বলুন?

৬) পণ্ডিতগণের কল্পের আয়ু লক্ষ লক্ষ বৎসর বলিবার কারণ কী? প্রকৃতপক্ষে কল্পের আয়ু কত?

৭) প্রকৃত বৈষ্ণব কে? পরমাত্মার স্থাপন, বিনাশ ও পালন সম্বন্ধে বুঝাইয়া বলুন।

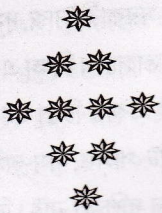

মনুষ্যাত্মার ৮৪ জন্ম-বৃত্তান্ত

ব্রহ্মাকুমারী — পুরো কল্পে মনুষ্যাত্মা ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে না, কিন্তু ৮৪ বার মনুষ্য যোনিতেই জন্মগ্রহণ করে। এতএব এই যোনি পরিবর্তনের ইতিহাস মনুষ্য যোনিতেই মনুষ্যাত্মার উত্থান-পতনের ইতিহাস।

স্বপন — কিন্তু আমি ইহাই শুনিয়া আসিতেছি যে মনুষ্য ৮৪ লক্ষ যোনি ভোগ করিবার পর মনুষ্য শরীর লাভ করে, আর সেই জন্যই মনুষ্য জন্মকে দুর্লভ অমূল্য-জন্ম বলিয়া গণ্য করা হয়।

ব্রহ্মাকুমারী — যদি মনুষ্যাত্মার পশু-পক্ষী ইত্যাদি ৮৪ লক্ষ যোনি ভোগ করিবার পর দুর্লভ যোনিতে জন্ম হইত তাহা হইলে তাহার দুঃখ ভোগ করিবার কথা নয়, বরঞ্চ সুখ ভোগ করিবারই কথা। কিন্তু দেখা যায় যে মনুষ্যাত্মা দুঃখ ভোগ করে আর সুখও ভোগ করে। অতএব এই যুক্তি ঠিক নয় যে দুঃখ ভোগ করিবার জন্য মানুষকে পশু-পক্ষী ইত্যাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মনুষ্য যোনিতেই অনেক প্রকার দুঃখ আছে; মনুষ্যাত্মাকে দুঃখ ভোগ করিবার জন্য পশু যোনিতে যাইতে হয় না। আপনি দেখিবেন যে মনুষ্য জীবনে যত প্রকারের দুঃখ আছে, পশু যোনিতে তত প্রকারের দুঃখ নাই। মনুষ্যত্মাকে দুঃখ ভোগ করিবার জন্য পশু যোনিতে যাইতে হয় না। উদাহরণ স্বরূপ, ক্রমবর্ধমান সরকারী ট্যাক্স, দুর্মূল্য, দুষ্প্রাপ্যতা ইত্যাদির চিন্তা, সন্তান-সন্ততিদের ভরণ-পোষণ, তাহাদের শিক্ষা এবং বিবাহ ইত্যাদির চিন্তা কেবল মনুষ্যেরই আছে। পশু-পক্ষী এই প্রকার চিন্তা হইতে মুক্ত। পশু-পক্ষীদের মান-অপমান, বেশ-ভূষা, ঘর-বাড়ি, খাট-পালঙ্ক, দাস-দাসী, মামলা-মোকদ্দমা, পরীক্ষার চিন্তা, পুলিশের ভয় ইত্যাদি কোন দুশ্চিন্তা নাই। কিন্তু মনুষ্যের জীবনেই অনেক প্রকারের অবস্থা, বেদনা, চিন্তা, চেষ্টা, আবশ্যকতা, কামনা বাসনা, হা-হুতাশ আছে যাহার জন্য মনুষ্যের জীবন সর্বদা দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত থাকে। ইহা ছাড়া রোগ-শোক, দুর্ঘটনা,

প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা হিংস্র জীবের দ্বারাও মানুষ বহুপ্রকারের দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। তাহা হইলে যখন মনুষ্য যোনিতেই মনুষ্যাত্মার বহুপ্রকারের দুঃখ ভোগের ব্যবস্থা আছে তখন যোনি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত কেমন করিয়া মানিয়া লওয়া যায়? ইহা ছাড়া আমরা প্রায়ই দেখি যে অনেক পশু-পক্ষী কোন কোন মনুষ্য হইতেও অধিক সুখী।

উদাহরণ স্বরূপ, রেসের ঘোড়া অথবা গৃহপালিত কুকুরের উপর লোকে বহু অর্থ খরচ করে। ধনীর কুকুর গাড়ি চড়িয়া বেড়ায় এবং অনেক ভাল-ভাল খাদ্য খায়। কিন্তু আজ সংসারে লক্ষ-লক্ষ মানুষ ক্ষুধায় কাতর হইয়া রাস্তায় বসিয়া আছে। এক টুকরো রুটির জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে। রেসের ঘোড়ার শিক্ষক, তত্ত্বাবধানকারী লোক এমন কি ডাক্তারের পর্যন্ত বন্দোবস্ত আছে। এক একটি ঘোড়ার মূল্য এত যে মানুষের মূল্য তুলনার যোগ্য নয়। এক একটি ঘোড়ার পরিচর্যা করিবার জন্য বেশ কিছু লোক নিযুক্ত হইয়া থাকে। এমন অনেক লোক আছে যাহাদের ভাগ্যে দুধ বা ঔষধ জোটেই না। অতএব ইহা স্পষ্ট যে মনুষ্যাত্মা মনুষ্য যোনিতেই সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। আত্মার যোনি পরিবর্তনের যুক্তি মিথ্যা কল্পনা মাত্র। দ্বিতীয় যুক্তি হইতেছে মনুষ্য পশু পক্ষী হইতে অধিক সংবেদনশীল। যেমন ধরুন কোন মানুষ কোন সভা সমিতিতে দুই একটি অপমানসূচক শব্দ শুনিয়া এমনই আত্মাশ্লাঘা বা অপমান বোধ করে যে তাহার হৃদয়ের স্পন্দন হয়ত চিরদিনের মত থামিয়া যায়, অথচ একটি গর্দভকে দণ্ডদ্বারা আট দশ বার আঘাত করিলেও সে তত দুঃখ বোধ করে না। সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে মানুষকে পাপ ভোগ করিতে অন্য যোনিতে যাইতে হয় না বরং অধিক সংবেদনশীল হওয়ার জন্য মনুষ্য সামান্য কারণে মনুষ্য যোনিতেই অধিক দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

স্বপন — পশু পক্ষী ইত্যাদির কর্মেন্দ্রিয় কম সংবেদনশীল হয়। যেমন ধরুন গরুর কথা বলিবার ক্ষমতা নাই বা গর্দভের বুদ্ধি অত্যন্ত অল্প। ইহা দেখিয়া মানুষ এইরূপ

মনে করে যে মনুষ্যাত্মাকে গর্হিত কর্মের দণ্ড ভোগ করিবার জন্য নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম লইতে হয়।

ব্রহ্মাকুমারী — আপনি দেখিয়া থাকিবেন যে মানুষের মধ্যেও অনেকে ইন্দ্রিয়ের কম কার্য ক্ষমতা প্রাপ্ত করিয়া থাকে। যেমন ধরুন, কেহ জন্মান্ধ, কেহ জন্ম বধির অথবা খঞ্জ। সুতরাং কম ইন্দ্রিয় ক্ষমতা লাভ করিবার নিমিত্তে যোনি পরিবর্তনের দরকার নাই।

স্বপন — দিদি, যেমন সরকার অপরাধীকে সাজা দেওয়া ছাড়াও তাহার অপরাধ প্রবণতা সংশোধন করিবার জন্য জেলে আবদ্ধ রাখে, ঐরূপ মনুষ্যাত্মার দূষিত বৃত্তিগুলির সংশোধনার্থে হয়ত যোনি পরিবর্তন প্রয়োজন।

ব্রহ্মাকুমারী — প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, জেলে অন্য অপরাধীর সংস্পর্শে আসিয়া অপরাধীর অপরাধ প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পায়। সেইরূপ গর্হিত কর্মের ফলস্বরূপ নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম লইলে মনুষ্যাত্মাও সংশোধিত না হইয়া আরও অধিক অপরাধ প্রবণ হয়। ধরুন কেহ চৌর্য বৃত্তির অপরাধে বিড়াল যোনিতে জন্মগ্রহণ করিল, তাহা হইলে উহার চৌর্য বৃত্তির সংশোধন না হইয়া দিনে দিনে উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

স্বপন — দিদি, আপনি বলিয়াছেন যে আত্মা জ্যোতির্বিন্দু বিশেষ। অতএব আত্মা সহজেই মনুষ্য দেহ ছাড়িয়া ছোট প্রাণীর দেহে যাইতে পারে।

ব্রহ্মাকুমারী — যেমন বীজ তেমন বৃক্ষ অথবা ফল। আমের বীজে আম গাছ এবং আম হয়। আবার জামের বীজে জামগাছ এবং জাম হয়। আমের বীজে লঙ্কাগাছ হয় না। এই প্রকার মনুষ্যাত্মা পশু যোনিতে যায় না। মনুষ্যাত্মা পশু হইতেও অধিক কামী, অধিক ক্রোধী অথবা অধিক হিংস্র হইতে পারে কিন্তু উহার জন্ম কদাপি পশু যোনিতে হয় না।

স্বপন — ভক্তগণ বলেন অন্তিম সময়ে যেমন বৃত্তি হয় আত্মার সেই রূপ গতি হইয়া থাকে। কেহ যদি অন্তিম সময় স্ত্রীর কথা স্মরণ করে, তবে তাহার শূকর অথবা কুকুর যোনিতে জন্ম হয়।

ব্রহ্মাকুমারী — ভগবান বলিতেছেন অন্তিম সময়ে মনুষ্যের যেমন স্মৃতি হয়, সেইরূপ বাসনা সে সঙ্গে লইয়া যায়, কিন্তু জন্ম হয় মনুষ্য যোনিতেই। যেমন, কেহ কাম বাসনা লইয়া যদি মরে, তাহা হইলে পরের জন্ম সে মনুষ্য শরীরই ধারণ করে কিন্তু তাহার কাম বাসনা অধিক হয়। বস্তুতঃ সংস্কার, বৃত্তি এবং বাসনার ফলস্বরূপ মনুষ্যাত্মা পশুর মত দেহ ধারণ করে না। মনুষ্যের দেহই ধারণ করে, কিন্তু তাহার মন ও আচরণ হয় পশুর মত। আবার মনুষ্য কুকর্মের ফলস্বরূপ যদি পশু যোনিতে জন্মগ্রহণ করিত তাহা হইলে দিনে দিনে জন সংখ্যাও এত বাড়িত না। কখনও কখনও সমাচার পত্রে দেখা যায় যে কোন কোন মনুষ্যাত্মা পূর্বজন্মের কথা বলিতেছে। যেমন পূর্বজন্মে তাহার কে মাতা বা কে পিতা ছিল; কেহ হয়ত তাহার পূর্বজন্মের স্ত্রীর কথা বলিতেছে ইত্যাদি। কিন্তু এ পর্যন্ত এইরূপ সমাচার কোন সমাচার পত্রে ছাপিতে দেখা যায় নাই যে কেহ বলিতেছে যে সে পূর্ব জন্মে পশুর সন্তান ছিল। অতএব এই সমস্ত বিচার করিলে ইহাই সিদ্ধ হয় যে মনুষ্যাত্মার পশু যোনিতে জন্ম হয় না।

স্বপন — দিদি, মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবার আনন্দ স্বাভাবিক। কিন্তু পশুর আত্মা যদি পশু যোনিতেই থাকে তবে উহাদের সুখ মিলিবে কবে?

ব্রহ্মাকুমারী — মনুষ্য ভাল হইলে সমস্ত সৃষ্টিই ভাল হয়। মনুষ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সৃষ্টির পতন। সত্য ও ত্রেতা যুগে মনুষ্য সম্পূর্ণ পবিত্র হয়। ঐ সময় সমস্ত সৃষ্টি স্বর্গ হয়। তখন পশু পক্ষীও সুখী হয়। অতএব এখন পশুর চিন্তা ছাড়িয়া আপনি নিজের চিন্তা করুন।

স্বপন — দিদি, এখন বুঝিতে পারিলাম যে পুনর্জন্ম হয় কিন্তু আত্মার যোনি পরিবর্তন হয় না। এখন আপনি আমাকে মনুষ্যাত্মার ৮৪ জন্মের কাহিনি বলুন।

ব্রহ্মাকুমারী — আমি পূর্বেই সৃষ্টি চক্রের আবর্তন কী করিয়া হয় তাহা আলোচনা করিয়াছি। এখন ত্রিকালদর্শী জন্ম মৃত্যু রহিত পরমাত্মা শিব আমাদিগকে মনুষ্যাত্মার ৮৪ জন্মের যে বৃত্তান্ত শুনাইয়াছেন তাহা বিষদভাবে আলোচনা করিতেছি। মনযোগ পূর্বক শ্রবণ করুন।

সর্বপ্রথম সত্যযুগ। সত্যযুগী সৃষ্টিই স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠ নামে পরিচিত। ঐ সময় শ্রীনারায়ণ এবং তাঁহার বংশধরদের রাজ্য হয়। ১২৫০ বৎসরের এই যুগে শ্রীনারায়ণের আত্মার কুল ৮ জন্ম ধরিয়া সূর্যবংশী রাজা-রানি বা রাজবংশের সদস্যরূপে রাজত্ব করেন। তাঁহাদের প্রথম জন্মে আয়ুষ্কাল ১৫০ বৎসর হয়। তাঁহারা ১৬ কলা, সম্পূর্ণ নির্বিকারী, সর্বগুণসম্পন্ন ও পুরুষোত্তম ছিলেন। এইজন্য তাঁহাদিগকে দেবতাবর্ণ বা সত্ত্বঃপ্রধান বলিয়া গণ্য করা হয়। এই যুগের রাজকুলের সদস্য সংখ্যা ১৬১০৮ এবং প্রজার সংখ্যা ৯ লক্ষ। অতএব মোট জন সংখ্যা ৯,১৬,১০৮।

ইহার পর ত্রেতা যুগ। এই যুগের দেবতাদের আয়ুষ্কাল ১২৫ বৎসর হইতে ১০০ বৎসরের মধ্যে হয়। ১২৫০ বৎসরের সেই যুগে শ্রীনারায়ণের আত্মা প্রায় ১২ জন্ম ধরিয়া চন্দ্রবংশী রাজা-রানি বা রাজকুলের সদস্য রূপে রাজত্ব করেন। এই যুগে উহাদের আত্মা ১৪ কলা, সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয় এবং এইজন্য উহাদিগকে সত্ত্বগুণী ক্ষত্রিয় বর্ণ বলা হয়। ত্রেতার প্রারম্ভে শ্রীরাম এবং শ্রীসীতার রাজ্য হয়। এই যুগেও রাজকুলের সদস্য সংখ্যা হয় ১৬,১০৮। কিন্তু প্রজার সংখ্যা হয় ৩৩ কোটি। অতএব মোট জন সংখ্যা হয় ৩৩,০০,১৬,১০৮। সত্য ও ত্রেতা যুগে সম্পূর্ণ সুখ বিরাজমান থাকে। এই উভয় যুগে প্রকৃতিও যথাক্রমে সত্ত্ব প্রধান ও সত্ত্বগুণী হয় এবং জীবজন্তু, পশু পক্ষীও অনুরূপভাবে সুখী হয়।

ত্রেতা যুগের অবসানে দ্বাপর যুগ শুরু হয়। এই যুগে সত্ত্বগুণী ক্ষত্রীয়দের আত্মা ক্রমশঃ দেহ অভিমানী (Body Conscious) এবং বিকারী হইয়া পড়ে, আর তাহার ফলে তাহারা দেবপদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পূজারী মনুষ্যের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাহাদের এই রজঃপ্রধান স্থিতির জন্য তাহাদের বর্ণকে বৈশ্য বর্ণ বলা হয়। ১২৫০ বৎসরের

এই যুগে ভক্ত শিরোমণি রাজা-রানি অথবা উচ্চ কুলের প্রজারূপে তাহারা ২১ বার জন্মগ্রহণ করে। সর্বপ্রথম তাহারা নিরাকার শিবের পূজা আরম্ভ করে। ক্রমশঃ তাহারা রজঃগুণী অবস্থা হইতে রজঃ প্রধান অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং যতই দিন যায় ততই পতিত হইতে থাকে। ফলে নিজেদেরই পূর্বস্বরূপ যথা শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীনারায়ণ অথবা শ্রীরাম ও শ্রীসীতার পূজা করিতে থাকে। ক্রমশঃ অন্যান্য দেবী দেবতার পূজা অর্চনা শুরু হইয়া যায় এবং শাস্ত্র তৈয়ারি হয়। এই রূপে ভক্তিও অব্যভিচারী হইতে ব্যভিচারীতে পরিণত হয়, অর্থাৎ এক পরমাত্মাকে ভক্তি না করিয়া অনেককে ভক্তি করিতে থাকে।

দ্বাপর যুগের পর আসে কলিযুগ। এই যুগে মায়ার অর্থাৎ পাঁচ বিকার যথা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এবং অহঙ্কারের প্রকোপ সৃষ্টির উপর দিন-দিন বাড়িতে থাকে। ক্রমশঃ মনুষ্যাত্মা তমোগুণী অবস্থা হইতে তমোপ্রধান অবস্থায় উপনীত হয়। অতএব সকল নরনারীই শূদ্র বর্ণের হয় এবং পূজারি রাজা-রানি অথবা প্রজা রূপে ৪২ বার জন্মগ্রহণ করে। এই যুগে ভক্তি এতই ব্যভিচারী হইয়া পড়ে যে অগ্নি, জল, বৃক্ষ, প্রস্তর ইত্যাদিরও পূজা-অর্চনা হইতে থাকে। দ্বাপর ও কলিতে জনসংখ্যা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইয়া কলির অন্তে ৭০০ কোটিরও অধিক জনসংখ্যা হয়। প্রজার উপর প্রজার শাসন হয়। ফলে অনুশাসন-হীনতা, মতভেদ, ধর্মভেদ, ভাষাভেদ প্রভৃতি সমস্যার উৎপত্তি হয় এবং মানুষের জীবন দুঃখের চরম শিখরে উঠে। ভারতের অবস্থা একেবারে জর্জরীভূত হয়। যে ভারত স্বর্গ ছিল, পরমাত্মার সহিত যোগ রহিত হওয়ায় সেই ভারত শশ্মানে পরিণত হয়।

এইরূপে সত্যযুগী শ্রীনারায়ণ যখন কলিযুগের অন্তিম জন্মে বাণপ্রস্থ অবস্থায় উপনীত হন, তখন তাঁহার শরীরে পরমপিতা পরমাত্মা শিব অবতরণ করেন এবং সহজ-গীতা জ্ঞান ও রাজযোগ শিক্ষা দিয়া পতিত মনুষ্যকুলের উদ্ধার সাধন করেন। পরমপিতা পরমাত্মা দ্বারা এই জ্ঞান ও যোগ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পতিত মনুষ্যাত্মা 'মরজীবা জন্ম' লাভ করে। মনুষ্যাত্মার এই ৮৪ জন্মের উত্থান-পতনের কাহিনিকেই

প্রকৃত 'সত্যনারায়ণের কথা' বা 'অমর কথা' বলে, কেন না অমরনাথ শিব কলিযুগী মৃত্যু লোককে সত্যযুগী অমর লোকে পরিণত করিবার জন্য এই কথা শোনান।

মরজীবা জন্ম

স্বপন— দিদি, 'মরজীবা জন্ম' কি তাহা উত্তম রূপে ব্যাখ্যা করুন।

ব্রহ্মাকুমারী— 'মরজীবা জন্ম' কথার অর্থ হইতেছে জীবন থাকিতে মরিয়া জন্ম লওয়া অর্থাৎ পুরানো বিকারী অভ্যাস ত্যাগ করিয়া নূতন দিব্য অভ্যাসে অভ্যস্থ হওয়া। অর্থাৎ পুরানো দিনের কথা একেবারে ভুলিয়া যাওয়া এবং পুরানো অভ্যাসগুলির পুনরাবৃত্তি না করা। ভাবটা এইরূপ, যেন আমি পুরানো অভ্যাস বা পুরানো দিনের ঘটনা হইতে মরিয়া গিয়াছি। ইহাকে "জীতে-জী-মরা" ও বলে। মোট কথা পুরানো সব কিছু ভুলিয়া যাওয়া।

প্রশ্ন

১) মনুষ্য যোনিতেই মনুষ্য কেমন করিয়া আপন কর্মফল ভোগ করে?

২) মনুষ্যাত্মার ৮৪ জন্মের উত্থান ও পতনের কাহিনি আলোচনা করুন।

৩) প্রকৃত সত্যনারায়ণ-কথা বা অমর কথা কী?

৪) 'মরজীবা জন্ম' বা 'জীতে-জী-মরা'র অর্থ কী?

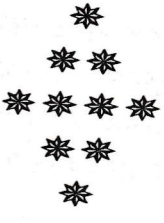

ভারতবাসীর ধর্মের প্রকৃত নাম এবং ধর্মশাস্ত্রের পরিচয়

ব্রহ্মাকুমারী — আপনি পরিচয় পত্রে আপনার ধর্মের নাম 'হিন্দুধর্ম' লিখিয়াছেন?

স্বপন — আজ্ঞে হ্যাঁ, ইহাই তো জানি যে আমরা হিন্দু।

ব্রহ্মাকুমারী — জাপানে বসবাসকারী নিজেদের জাপানী বলে, তাহা হইলে তাহাদের ধর্ম কি জাপানী ধর্ম হইবে? ফ্রান্স দেশের লোক নিজেদের ফ্রেঞ্চ বলে, তাহা হইলে কি তাহাদের ধর্ম ফ্রেঞ্চ হইবে! ইহা মোটেই যুক্তিযুক্ত নহে। সিন্ধু নদীকে বিদেশীরা ইন্দু বা 'ইণ্ডাস' (Indus) বলে এবং সেই অর্থে উহার পার্শ্ববর্তী বসবাসকারী লোকদিগকে হিন্দু বা 'ইণ্ডিয়ান' বলে। তাহা হইলে আমাদের ধর্ম আমাদের দেশের নাম অনুযায়ী হইবে কি? ধর্মের নাম তো ধর্ম-স্থাপকের নামের সহিত সম্বন্ধিত হয়। যেমন ধরুন বুদ্ধ যে ধর্মমত স্থাপন করিয়াছেন উহার নাম বৌদ্ধ ধর্ম। ইসা বা ক্রাইষ্ট যে ধর্ম স্থাপন করিয়াছেন তাহার নাম ইসাই বা খ্রীষ্টান ধর্ম। সুতরাং ধর্মের নাম ধর্মের কোন মুখ্য মন্তব্য অথবা ধর্ম স্থাপকের নামের সহিত সম্বন্ধিত। দেশের নাম অনুসারে ধর্মের নাম তো হয় না। ইহা ছাড়া আপনি বলুন হিন্দুধর্ম কাহার দ্বারা এবং কখন স্থাপিত হইয়াছে?

স্বপন — দিদি, কেহই বলিতে পারে না, ইহা কাহার দ্বারা এবং কখন স্থাপিত হইয়াছে। লোকে বলে যে ইহা আদিকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে; কিন্তু বিবেক ইহাই বলে যে, কোন না কোন সময় অবশ্যই কেহ ইহা স্থাপন করিয়া থাকিবে।

ব্রহ্মাকুমারী — আমাদের ধর্ম সর্ব-প্রাচীন। সময় ও ঘটনা প্রবাহের বিবর্তনে কালক্রমে আমরা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মের প্রকৃত নাম, ধর্ম স্থাপকের নাম এবং উহার স্থাপন কাল ভুলিয়া গিয়াছি। এখন পরমপিতা পরমাত্মা শিব আমাদিগকে সৃষ্টি-চক্র ও মনুষ্যাত্মার ৮৪ জন্মের উত্থান পতনের জ্ঞান দিয়া বুঝাইয়াছেন যে আমাদের ধর্মের

প্রকৃত নাম **"আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম"**। ইহাকে আদি সনাতন ধর্ম বলা হয় এইজন্য যে ইহা সত্যযুগের আদিকাল হইতে চলিয়া আসে এবং কলিযুগের অন্তে যখন পূর্ণ ধর্মগ্লানি হয় তখন স্বয়ং পরমাত্মা শিব প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাকার মাধ্যম দ্বারা ইহাকে পুনঃস্থাপন করেন। সুতরাং সৃষ্টির মহাবিনাশ হইলেও এই ধর্মের বিনাশ হয় না। এই নামের সহিত দেবী-দেবতা শব্দ যুক্ত হইয়াছে এইজন্য যে এই ধর্মের আদিকাল অর্থাৎ সত্য ও ত্রেতা যুগের লোকেরা দেবী-দেবতা ছিল। এখন বলুন আমাদের ধর্ম শাস্ত্রের নাম কী?

স্বপন — আমি এইরূপ বুঝি যে আমাদের ধর্ম-শাস্ত্র হইল বেদ্, উপনিষদ্, পুরাণ ইত্যাদি।

ব্রহ্মাকুমারী — প্রত্যেক ধর্মের একই ধর্মস্থাপক এবং একই ধর্মগ্রন্থ হয় যেমন ইসাই ধর্মের ধর্ম-গ্রন্থের নাম 'বাইবেল'। মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থের নাম 'কোরান' এবং বৌদ্ধদের 'ধর্ম্মপদ' ইত্যাদি। আমাদের ধর্ম তো স্বয়ং ভগবান শিব প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন করিয়াছেন। তাহা হইলে বলুন স্বয়ং ভগবানের মহাবাক্য কোন শাস্ত্রে আছে? এইরূপ শাস্ত্র গীতা। গীতারই নাম শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা যাহার অর্থ হইতেছে ভগবানের **'জ্ঞানগীত'**। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন যে, যখন ধর্মগ্লানি হয় তখন অধর্মের বিনাশ করিয়া সৎধর্মের স্থাপন করিবার জন্য আমি অবতরণ করি। কিন্তু যে সমস্ত লোক নিজেদের হিন্দু বলিতেছে তাহারা সেই ধর্মের নাম পর্যন্ত জানে না।

গীতার ভগবান কে?

স্বপন — গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের মহাবাক্য আছে!

ব্রহ্মাকুমারী — আপনাকে পরমপিতা পরমাত্মার দিব্য নাম, দিব্য-রূপ, দিব্য-ধাম ইত্যাদির যে পরিচয় দিয়াছি তাহার দ্বারা বিচার করিয়া দেখুন যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান না

দেবতা। আপনাকে আমি পূর্বেই বুঝাইয়াছি যে ভগবানের জন্ম বা মৃত্যু নাই। তিনি শিশুর ন্যায় লালিত-পালিত হন না এবং তাঁহার কোন মাতা পিতা নাই। তিনি সকলের পরমপিতা, অভোক্তা এবং কর্মাতীত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মাতা পিতা এবং শিক্ষক সবই ছিল। আপনাকে ইহাও বলিয়াছিলাম যে ভগবান ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কর নামক তিন দেবতারও রচয়িতা অর্থাৎ ত্রিমূর্তি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর সাকার রূপ অর্থাৎ দেবতা ছিলেন। ভগবান ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপন, বিষ্ণুর দ্বারা পালন এবং শঙ্করের দ্বারা বিনাশ করান। সুতরাং বিষ্ণু তো পালনের নিমিত্ত, তিনি ধর্মস্থাপন এবং অধর্মের বিনাশের নিমিত্ত নন। ভগবান শরীরধারী নন। তিনি জ্যোতিস্বরূপ এবং সকল ধর্মের আত্মার পরমপিতা। এখন ভাবিয়া দেখুন, শ্রীকৃষ্ণকে কি সমস্ত আত্মার পরমপিতা বলা যাইতে পারে? ভগবানের কি কোন স্ত্রী, লৌকিক সন্তান ইত্যাদি হয়? ভগবান অভোক্তা এবং তিনি রাজ্যভাগ্য ও সুখ সম্পত্তি দাতা। শ্রীকৃষ্ণ কি অভোক্তা? ভগবান বলিতেছেন—**"আমার জন্ম দিব্য এবং কর্তব্যও দিব্য"**। আমি ইহাও বলিয়াছি যে দিব্য জন্ম মানে **পরকায়ায় প্রবেশ**। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জন্ম পরকায়ায় প্রবেশ রূপে হয় নাই। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেবতা বলিবেন, না ভগবান বলিবেন? গীতাজ্ঞান দাতারূপে ভগবান শিবকে মানিবেন, না দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে মানিবেন তাহা চিন্তা করিয়া দেখুন।

স্বপন — দিদি আপনার সমস্ত কথাই মানিয়া লইলাম, কিন্তু এইরূপ ও হইতে পারে যে পরমপিতা পরমাত্মা শিব শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করিয়া দ্বাপরে এই জ্ঞান দিয়াছিলেন?

ব্রহ্মাকুমারী — ভাবিয়া দেখুন যদি ভগবানের দিব্য অবতরণ দ্বাপরের শেষে হইত

এবং তিনি অধর্মের বিনাশ করিয়া দেবী ধর্মের স্থাপন করিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে দ্বাপরের পরই সত্যযুগ, ধর্মযুগ বা দেবযুগ আসিয়া যাইত। কিন্তু আপনি জানেন যে দ্বাপরের পরই কলিযুগ অর্থাৎ অধর্মের যুগ শুরু হয়। আপনাকে পূর্বেই বলিয়াছি যে কলির অন্তে অত্যন্ত ধর্মগ্লানির সময় ভগবানের দিব্য অবতরণ হয়—অধর্মের বিনাশ এবং সৎধর্মের স্থাপনের জন্য। শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীনারায়ণ পদ পরমাত্মা গীতা-জ্ঞানের **'প্রালব্ধ'** স্বরূপ দিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণকে বৈকুণ্ঠনাথ বলা হয়। বৈকুণ্ঠ বা স্বর্গ সত্য যুগেই হয় অতএব ইহাই প্রমাণিত হয় যে শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সয়ম্বরের পর তিনিই শ্রীনারায়ণ রূপে পরিচিত হন। ভক্তরা শ্রীকৃষ্ণের কীর্তন করিবার সময় বলেন—"শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ, হরে-মুরারি, হে নাথ, নারায়ণ, বাসুদেব" ইত্যাদি! এইজন্য শ্রীনারায়ণের বাল্যকালের চিত্র বা জীবন কাহিনি পাওয়া যায় না। অতএব ইহাই প্রমাণ হয় যে শ্রীকৃষ্ণই শ্রীনারায়ণ এবং তিনি সত্যযুগী পবিত্র সৃষ্টিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

স্বপন — আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি বলিয়াছিলেন যে ঐ যুগকে কল্যাণকারী পুরুষোত্তম যুগ বলা হয়।

ব্রহ্মাকুমারী — হ্যাঁ, ভগবান ঈশ্বরীয় জ্ঞান দ্বারা মনুষ্যকে দেবতা করেন। যদি আপনি শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বিবেচনা করেন তাহা হইলে দেবতা কাহাকে বলিবেন? শ্রীকৃষ্ণ ষোলকলা পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী, মর্যাদা পুরুষোত্তম প্রথম বিশ্ব মহারাজকুমার। তিনি অপবিত্র সৃষ্টিতে পদার্পণই করিতে পারেন না! বিকারী হাত তাঁহাকে স্পর্শ পর্যন্ত করিতে পারে না। তিনি অপবিত্র দ্বাপর যুগে কেমন করিয়া আসিবেন? সুতরাং **কলিযুগের অন্তে এবং সত্যযুগের প্রারম্ভের সঙ্গম সময়েই ভগবান অবতীর্ণ হন**। তিনি ময়ূর মুকুটধারী অতি সুন্দর, শ্রেষ্ঠ দেবতা শ্রীকৃষ্ণের শরীরে আসেন না।

বরঞ্চ প্রজাপিতা ব্রহ্মার মত অতীব সাধারণ মনুষ্য শরীরে আসেন। কারণ ভগবানের মহাবাক্যই হইতেছে—"হে বৎস, আমি অব্যক্ত পরমাত্মা অতি সাধারণ এক মনুষ্যের শরীরে আসি। এইজন্যে অনেক মূঢ়মতি লোক আমাকে ব্যক্ত মানে আবার অনেকে আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।" অতএব আপনি এ বিষয়ে অবগত হউন যে, প্রজাপিতা ব্রহ্মার শরীরে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার দ্বারা অপরকে গীতা জ্ঞান দান করেন, সেই **প্রজাপিতা ব্রহ্মাই সত্যযুগের আদিতে গীতা জ্ঞানের প্রালব্ধ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীনারায়ণ পদ প্রাপ্ত করেন**। আবার ভগবানের অবতরণের সময় ঐ ব্রহ্মাই সাধারণ মনুষ্যরূপে ৮৪ জন্মে পদার্পণ করিয়া বানপ্রস্থ অবস্থায় উপনীত হন। সেইহেতু গীতা শ্রীকৃষ্ণেরও মাতা এবং গীতা-জ্ঞান-দাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও পরমপিতা।

স্বপন — দিদি, এখন বুঝিতে পারিলাম যে ভগবান, দেবতাকুল বা সত্যযুগ স্থাপন করিবার জন্য প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাধারণ মনুষ্য শরীরে সঙ্গমযুগে অবতীর্ণ হন। ভগবান যদি শ্রীকৃষ্ণের দেবশরীরে আসিতেন তাহা হইলে অর্জুন প্রথমেই তাঁহাকে চিনিয়া লইতেন। কিন্তু মনে একটা সন্দেহের উদ্রেক হইতেছে যে, যদি গীতার ভগবান, প্রজাপিতা ব্রহ্মার শরীরে অবতরণ করিয়া থাকেন তবে তিনি কি অর্জুনের সারথী হইয়া কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করাইয়াছিলেন? আবার শ্রীকৃষ্ণকে যদি সত্যযুগের মহারাজ কুমার মানা যায় তবে ইহা মানিতে হইবে যে তিনি শ্রীরামের পূর্বে আসিয়াছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রে ইহার বিপরীত দেখা যায়।

ব্রহ্মাকুমারী — আপনার প্রশ্ন ঠিক। বিবেচনা করিয়া দেখুন, ভগবান সংধর্ম স্থাপন করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, না হিংসাযুক্ত যুদ্ধ করাইবার নিমিত্ত সারথী হইয়াছিলেন? কোন পিতা কি সন্তানদের কলহ বা ঝগড়া করিতে বলেন? কোন মহাত্মা কি যুদ্ধের উপদেশ দেন? তাহা হইলে মহাত্মারও মহাত্মা পরমপিতা পরমাত্মা যুদ্ধ বা রক্তপাত করাইবেন কী করিয়া? **ধর্ম মানেই অহিংসা**, তাহা হইলে হিংসার

উপদেশ দানকারী কেহ কি উচ্চধর্ম অর্থাৎ দেবী ধর্ম স্থাপন করিতে পারে? ভগবানের নিকট হইতে মনুষ্য দিব্যগুণ ভিক্ষা করে। ভগবান গীতা জ্ঞান দ্বারা মানুষকে দেবতায় পরিণত করেন। তিনি ক্রোধ, প্রতিশোধ, হিংসা, দ্বেষ এবং যুদ্ধ করিবার শিক্ষা দিতে পারেন না। অতএব ইহা অবগত হউন যে ভগবান যে সময় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই সময় সংসারের সমস্ত লোক অজ্ঞানী, যোগভ্রষ্ট এবং ধর্মভ্রষ্ট হইবার জন্য পরস্পর পরস্পরের শত্রু হইয়া পড়িয়াছিল। সমস্ত সংসারই এক যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের রূপ ধারণ করিয়াছিল। ঐ সময় পরমাত্মা প্রজাপিতা ব্রহ্মার শরীরে তাঁহার মানব আত্মা ছিলই, আবার ঐ শরীরেই পরমাত্মার দিব্য প্রবেশ হয়। অতএব ব্রহ্মার শরীর রূপ রথে অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মাকে দিব্যজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া এবং ব্রহ্মা-দ্বারা অপরকে উক্ত জ্ঞান দান করিবার কার্যকেই অর্জুনের সারথী হওয়া বলা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া ৮৪ জন্ম বৃত্তান্ত শুনাইবার সময় আমি বলিয়াছিলাম যে সত্যযুগে মানুষ ১৬ কলাপূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী থাকে এবং ত্রেতা যুগে দুই কলা কমিয়া উহা চৌদ্দ কলা হয়। অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরামের পূর্বে জন্মিয়াছিলেন।

১০৮ দানাযুক্ত মালার তাৎপর্য

স্বপন — দিদি, পুরাণে এইরূপ কথিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণের ১৬,১০৮ পাটরানি ছিল এবং তিনি গোপীদের বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন। উহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া বলুন।

ব্রহ্মাকুমারী — যে সমস্ত নর-নারী কাম ক্রোধ ইত্যাদি পাঁচ বিকারের বিরুদ্ধে জ্ঞান ও যোগবল দ্বারা যুদ্ধ করেন তাঁহাদের মধ্যে ১০৮ জন সম্পূর্ণ বিজয় প্রাপ্ত হন। তাঁহাদেরই স্মারক হিসাবে ১০৮ দানাযুক্ত মালা আজও চলিয়া আসিয়াছে। ভক্তরা

১০৮ দানাযুক্ত মালা জপ্ করিয়া থাকেন। এই মালার নাম **'বৈজয়ন্তী মালা'** অর্থাৎ জ্ঞান ও যোগবল দ্বারা মায়ার উপর সম্পূর্ণ বিজয় প্রাপ্ত ১০৮ জনের স্মরণ-চিহ্ন। এই ১০৮ দানাযুক্ত মালার উপরে যুগ্ম বড় দানা থাকে। ঐ যুগ্মদানা প্রজাপিতা ব্রহ্মা ও জগদম্বা সরস্বতীর প্রতীক। পরমাত্মা উহাদের দ্বারা জ্ঞান ও যোগ শিক্ষা দেন। মালার মধ্যে সর্বোপরি যে ফুল থাকে উহা পরমপিতা পরমাত্মা শিবের প্রতীক।

আর ঐ ১০৮ নর-নারীর আত্মা মায়ার উপর সম্পূর্ণরূপে বিজয় প্রাপ্ত হওয়ার জন্য বৈকুণ্ঠ অথবা স্বর্গে বিশ্ব মহারাজা অথবা বিশ্ব মহারানির পদ প্রাপ্ত হন। আবার উহাদের পরিবার বর্গ ও আত্মীয়-স্বজন সংখ্যায় ১৬,০০০ হন। অথবা বৈকুণ্ঠ বা স্বর্গে প্রথম শ্রেণির দেবী দেবতাগণের সংখ্যা ১৬,১০৮ হয়। এই কারণে ১৬,১০৮ সংখ্যা শুভ বলিয়া গণ্য করা হয়। কালক্রমে মানুষ ভুল করিয়া এইরূপ মতবাদ চালাইয়া দিয়াছে যে কৃষ্ণের ১৬,১০৮ পাটরানি ছিল। আপনি বিচার করিয়া দেখুন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ পবিত্র দেবতা শ্রীকৃষ্ণের ১৬,১০৮ পাটরানি হইতে পারে কি? এই কলঙ্ক বা অপবাদ অতি পতিত দৃষ্টি-যুক্ত মানুষ সম্পূর্ণ পবিত্র দেবতা শ্রীকৃষ্ণের উপর আরোপ করিয়া উহা শ্রবণকারী ও পঠনকারীকেও পতিত করিয়াছে।

দেহকে আত্মার বস্ত্র বলা হয়। গীতার ভগবান পরমাত্মা শিব কল্প বৃক্ষের জ্ঞান দিয়া জ্ঞান-স্নানকারী আত্মাদের শরীররূপী বস্ত্র হরণ করিয়া লইয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি তাহাদিগকে বিদেহী (দেহ বোধ রহিত) করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু অজ্ঞানী ব্যক্তি পুরুষশ্রেষ্ঠ দেবতা শ্রীকৃষ্ণের উপর এই কলঙ্ক লেপন করিয়াছে যে তিনি গোপীদিগের বস্ত্র হরণ করিয়াছিলেন। ইহা কত বড় মহাপাপ।

স্বপন — দিদি, এখন বুঝিতে পারিলাম যে এই গভীর রহস্যপূর্ণ তথ্যকে লোকে বিকৃত করার ফলস্বরূপ মনুষ্য দিন-দিন পতিত হইয়া নিজেদের সর্বোত্তম ধর্মকে পরিত্যাগ করিতে এবং ভিন্নধর্ম গ্রহণ করিতে প্রেরণা লাভ করিয়াছে! সত্য বলিতে কী, পরমাত্মা শিব যে সহজ ঈশ্বরীয় জ্ঞান দান করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করিলে মনের

দরজা আপনা হইতেই খুলিয়া যায়! এই জ্ঞান সকলেরই লাভ করা উচিত।

ব্রহ্মাকুমারী — কেবল শ্রবণ করিলেই চলিবে না। পরমাত্মা প্রদত্ত এই গীতা জ্ঞান শ্রবণ, মন্থন ও ধারণ করিয়া সর্বগুণ-সম্পন্ন, ১৬ কলা, সম্পূর্ণ নির্বিকারী, মর্যাদা পুরুষোত্তম হইতে হইবে। এখন আমাদিগকে বৈজয়ন্তীমালা জপ্ করিবার পরিবর্তে বৈজয়ন্তীমালার চৈতন্য দানা স্বরূপ হইতে হইবে অর্থাৎ মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মা শিবের বৈজয়ন্তী হইতে হইবে।

প্রশ্ন

১) ভারতবাসীর প্রকৃত ধর্মের নাম কী?

২) ভগবান গীতা জ্ঞান দ্বাপর যুগে দিয়াছিলেন না পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে দিয়াছিলেন?

৩) গীতার ভগবান হিংসক যুদ্ধ করান কি?

৪) গীতা-জ্ঞান দাতা পরমপিতা পরমাত্মা শিব না শ্রীকৃষ্ণ?

৫) মালার ১০৮ দানা কাহাদের স্মরণ-চিহ্ন এবং বৈজয়ন্তী মালার তাৎপর্য কী?

❋
❋ ❋
❋ ❋ ❋ ❋
❋ ❋
❋

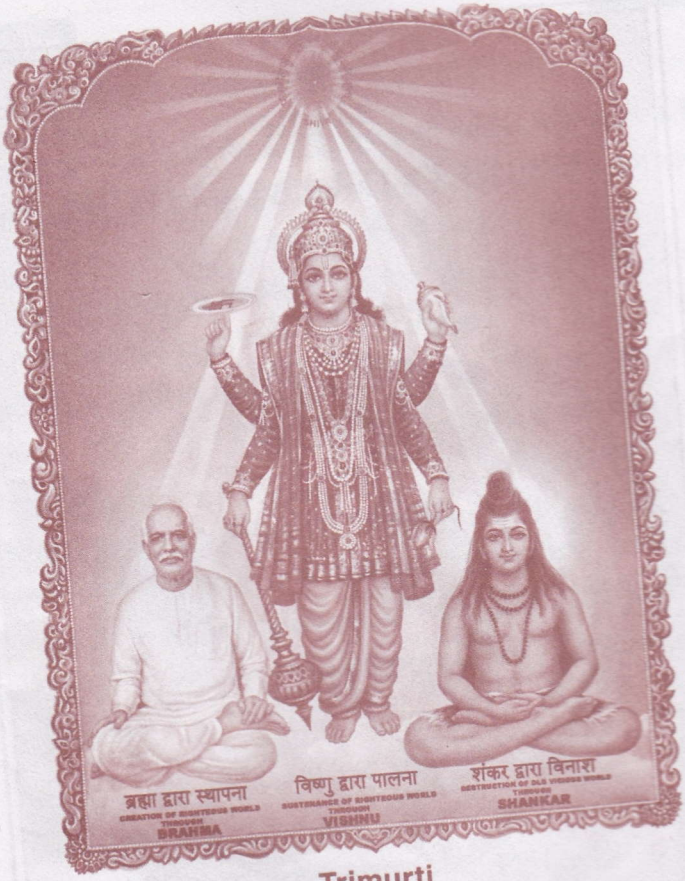

Trimurti

পরমাত্মা শিব তিন আকারী দেবতার রচনা করিয়া যথাক্রমে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা পবিত্র দুনিয়া তথা স্বর্গরাজ্যের স্থাপন (Generation) বিষ্ণুর দ্বারা পলন (Operation) ও শংকর দ্বারা কলিযুগী পতিত দুনিয়ার বিনাশ (Destruction) করিয়া থাকেন। সেইজন্যই তাহাকে ত্রিমূর্তিশিব বা GOD বলা হয়।

সৃষ্টি চক্র

WORLD-DRAMA WHEEL

সৃষ্টিরূপী নাটকের রচয়িতা এবং নির্দেশক কে?

ভারতের সর্বপ্রাচীন সহজ রাজযোগ

ব্রহ্মাকুমারী — আমি আপনাকে আত্মা, পরমপিতা পরমাত্মা, সৃষ্টি-চক্রের আদি-মধ্য-অন্ত এবং ভারতবাসীর আদি ধর্মের নাম ইত্যাদি বিষয়ের ঈশ্বরীয় জ্ঞান ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছি। এই জ্ঞান ব্যাখ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য শ্রোতাকে নষ্ট-মোহ করা এবং তাহার মনে আত্মিক স্মৃতি জাগরিত করা। আত্মিক স্মৃতি তথা পরমপিতা পরমাত্মার মধুর স্মৃতির দ্বারাই আত্মা আনন্দ এবং শান্তি লাভ করে। শুধু তাহাই নহে ইহার দ্বারা পূর্বের বহু জন্মের বিকর্ম দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইয়া যায়। গঙ্গায় স্নান করিলে যেমন শরীরের ময়লা দূর হইয়া যায়, তেমনই যোগাগ্নিতে আত্মার বহু জন্মের বিকর্ম বিনষ্ট হইয়া উহা পবিত্র হইয়া যায়। 'যোগই' (ঈশ্বর স্মরণ) প্রকৃত 'সৎসঙ্গ' কারণ আত্মা ইহার মাধ্যমে পরমাত্মার সঙ্গ প্রাপ্ত হয়। যোগবল দ্বারাই মানুষ চঞ্চল কর্মেন্দ্রিয় তথা মনোবিকার অথবা মায়ার উপর বিজয় লাভ করে। যোগের এমনি শক্তি যে উহার প্রভাবে প্রাকৃতিক তত্ত্ব সমূহও সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট হইয়া যায় এবং বিশ্বে শান্তি স্থাপিত হয়। অতএব কেবল এই জ্ঞান লাভ করিলেই চলিবে না, প্রকৃত যোগী হইতে হইবে।

সহজ রাজযোগ অভ্যাসের পদ্ধতি

স্বপন — দিদি, আমি এই যোগ শিক্ষা করিতে বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত। অতএব এই যোগের বিধি সম্বন্ধে বিশদ্‌ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলুন।

ব্রহ্মাকুমারী — 'যোগ' শব্দের অর্থ হইতেছে যুক্ত করা বা যুক্ত হওয়া। কিন্তু কাহার সহিত কাহাকে যুক্ত করিতে হইবে? আধ্যাত্মিক যোগের অর্থ হইতেছে আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ বা মিলন। ইহাকে সহজ যোগ বলা হয় এইজন্যে যে ইহাতে প্রচলিত হঠ্-যোগের ন্যায় কোন শারীরিক ক্রিয়া-কৌশল এর প্রয়োজন হয় না। ইহাতে কেবল বুদ্ধির দ্বারা স্মরণ করিবার প্রয়োজন হয়। স্মৃতি বা স্মরণ দ্বারাই

আত্মা-পরমাত্মার মিলন সাধিত হয়। যেমন কাহাকেও স্মরণ করিবার সময় তাহার নাম, ধাম এবং তাহার সহিত সম্বন্ধ ইত্যাদি জানিবার দরকার; তেমনই পরমাত্মাকে স্মরণ করিবার সময় তাঁহার প্রকৃত নাম, ধাম তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ এবং তাঁহার দিব্য কর্তব্য ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদের জানা একান্ত প্রয়োজন। যেমন ধরুন প্রবাসী পুত্রের কথা পিতার মনে সহজেই আসিয়া পড়ে, কেবল পত্র বা সংবাদ প্রেরণের দ্বারা এই স্বাভাবিক সম্বন্ধকে আরও নিবিড় করা যায়; তেমনি পরমাত্মার সহিত আমাদের আত্মার পিতা-পুত্রের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক কিন্তু আমাদের অবস্থা ঠিক দীর্ঘ প্রবাসী পুত্রের মত, যে তাহার পিতার সহিত সমাচার আদান-প্রদান না করিয়া সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে পিতা-পুত্রের স্বাভাবিক সম্পর্ক ঠিকই আছে, কিন্তু পুত্র আপনার ভুলবশতঃ পিতার স্নেহ-ভালবাসা অনুভব করিতে পারিতেছে না, পিতার লৌকিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিতেছে না। আমাদের অবস্থাও ঐরূপ। পরমপিতা পরমাত্মার সহিত আমাদের পিতা-পুত্রের যুগ যুগান্তরের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কিন্তু আমরা অবাধ্য প্রবাসী সন্তানের-ন্যায় তাঁহাকে ভুলিয়াছি, তাঁহার সহিত কোন যোগ রাখি নাই। ফলে তাঁহার দিব্য সম্পত্তি যথা অবিনাশী সুখ ও শান্তির জন্মসিদ্ধ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। **পিতা যেমন ঘর-ছাড়া সন্তানের খোঁজে বাহির হয়, পরমপিতা পরমাত্মা শিবও আপন পরমধাম হইতে আসিয়া নিখোঁজ সন্তানদের সহিত পুনর্মিলন করিবার জন্য সহজ ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও যোগ শিক্ষা দিতেছেন;** যাহাতে আমরা তাহার সহিত পুনরায় মিলিত হইতে পারি এবং সুখ ও শান্তির ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার বুঝিয়া লইতে পারি। পূর্বেই বলিয়াছি, যোগ বলিতে প্রচলিত কোন হঠযোগ বা প্রাণায়াম নহে। সহজ ভাবে পরমাত্মার স্মরণ বা তাঁহার সহিত মিলনের নাম সহজ যোগ। এই যোগকে রাজযোগ বলা হয় এইজন্য যে, যে সমস্ত নর-নারী এই যোগ অভ্যাস করিয়া নিজেদের পবিত্র করেন তাঁহারা বিশ্ব মহারাজ কুমার ও বিশ্বমহারাজ কুমারী, অর্থাৎ সত্যযুগী পবিত্র দেব-দেবী যথা শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীনারায়ণের পদ প্রাপ্ত করেন।

সহজ রাজযোগ অভ্যাস করিতে প্রথম প্রথম কিছু অনুশীলনের প্রয়োজন। পরে অভ্যাস সুপরিপক্ক হইলে ব্যবহারিক জীবনে কর্মরত অবস্থায়ও নিরন্তর যোগে থাকিতে কোন অসুবিধা হয় না। তবে বিশেষ যোগের নিমিত্ত বরাবরই নির্জন ঘর বা স্থানে নির্দিষ্ট সময় যোগাভ্যাস করিয়া যাইতে হইবে। রাত্রি ৩।।০ ঘটিকা হইতে সূর্যোদয়ের পূর্ব-পর্যন্ত এবং সূর্যাস্তের পর প্রায় এক ঘন্টা সময় বিশেষ যোগাভ্যাসের-উৎকৃষ্ট সময়। এই উভয় সময়েই সংসারের কোলাহল কমিয়া আসে, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াও অপেক্ষাকৃত পবিত্র থাকা আর কর্মের তাগিদ থাকে না এবং পরিবেশও শান্ত থাকে। সুতরাং এই ব্রাহ্মমুহূর্ত বা গোধূলির মধুর লগ্নে পরমপিতা পরমাত্মার মধুর স্মৃতিতে মগ্ন হইয়া, জাগতিক কোলাহলের উপরে বিচরণ করিবার উপযুক্ত সময়। নিয়মিত এই অভ্যাসের দ্বারা অপার আনন্দ, সুখ, শান্তিপ্রাপ্তি হয়। যোগাভ্যাসকালে যোগাভ্যাসকারীকে আত্মিক স্থিতি যুক্ত হইয়া ক্রমে মনকে ঊর্ধ্বমুখী করিয়া পরমধামে লইয়া যাইতে হইবে। তথায় জ্যোতির্বিন্দু পরমাত্মা-শিব, যিনি আমাদের সকল আত্মার—পরমপিতা, পরম শিক্ষক ও পরম সদ্‌গুরু , তাঁহাকে আত্মিক দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া তাঁহার নাম, রূপ ও দিব্য গুণগুলি স্মরণ করিতে হইবে!

স্বপন— দিদি, রাজযোগ অভ্যাসের ব্যবহারিক বিধি সম্পর্কে কিছু বলুন।

ব্যবহারিক প্রাথমিক বিধি

ব্রহ্মাকুমারী — রাজযোগ অভ্যাসের প্রথম পদক্ষেপ হইল 'আমি'কে, 'আমার' ঘর কোথায়, আমার 'স্বধর্ম' কী, 'আত্মার পিতা' কে, তাঁহার 'গুণ' কী ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক্ উপলব্ধি করা। সেইজন্য সারাদিনের কর্মের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা তথা স্ব-রূপে স্থিত হইয়া কর্মব্যবহার সম্পাদন করা। এইরূপ অভ্যাসের জন্য স্বচ্ছ ও পবিত্রভাবে বিধিপূর্বক সুনির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত অভ্যাস করিলে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে সর্বাধিক প্রাপ্তির অধিকারী হওয়া যায়।

এই জন্য রাজযোগাভ্যাসীকে স্থূল দুনিয়ার জাগতিক ব্যক্তি, বস্তু, পদার্থ এবং দৈহিক নাম-রূপ হইতে মনের সংকল্পকে সংকুচিত করিতে হয়। মনুষ্যলোকের ঊর্ধ্বে সূক্ষ্মলোকেরও পরপারে ব্রহ্মলোক বা পরমধামে স্থিত হইয়া বুদ্ধিযোগ এক ত্রিলোকীনাথ সর্বশক্তিমান পরমপ্রিয় শিববাবার সাথে স্থাপন করিয়া ঈশ্বরীয় মধুর স্মৃতির লগ্নে মগ্ন হইতে হয়।

স্বপন — দিদি, এইরূপ অভ্যাসের জন্য পদ্মাসনই শ্রেয়?

ব্রহ্মাকুমারী — না তেমন কোন বাধ্যবাধকতার প্রয়োজন নাই। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা এবং সৌজন্য বজায় রাখিয়া সুখাসীন সহজ স্থিতিতে স্থিত হইয়া বুদ্ধি দ্বারা আত্মা ও পরমাত্মার মনন চিন্তনের লগ্নে মগ্ন তথা স্নেহ ও প্রেমে লীন হওয়া। এক্ষণে মৃদু মৃদু স্বরে যাহা আমি বলিতে থাকিব আপনি, তাহা মনে মনে উচ্চারণপূর্বক তদ্রূপ স্থিতিতে স্থিত হইবার প্রয়াস করুন।

স্ব-স্বরূপে স্থিত হইবার বিধি

ওঁ শান্তি। আমি এক আত্মা ... আমি চোখ দ্বারা দেখিবার ... মুখ দ্বারা বলিবার ... কান দ্বারা শুনিবার ... মস্তিষ্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রণ ও স্মৃতিচারণ করিবার ... মন দ্বারা সংকল্প করিবার, বুদ্ধি দ্বারা বিচার ও নির্ণয় করিবার অধিকারী।

আমি চালাইলে তবেই এই অচেতন দেহ ক্রিয়াশীল হয় ... 'আমি'ই 'আমার' কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করিয়া থাকি ... আমি সংবেদনশীল সত্ত্বা ... সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্যোতির্বিন্দু ... জাজ্জ্বল্যমান দিব্য তারকা ... 'আমি' চেতন, কিন্তু 'দেহ' নহে ... আমি দেহ হইতে ভিন্ন বিদেহী সত্ত্বা ... আমি মুখমণ্ডল নয় ... আমি স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কাঠামোও নয় ... আমি শারীরিক নাম কিংবা রূপও নহে ... আমি অনুভব করিতেছি আমি ইহা হইতে ভিন্ন এক অবিনাশী সত্ত্বা ... যেন এক স্থির ... শীতল ... শান্তির প্রকম্পনের প্রবাহ আমার উপর আসিয়া পড়িতেছে ... ইহা কী অত্যাশ্চর্য অনুভূতি!

আমি এক আত্মা

... এখন আমি শারীরিক অঙ্গ সকল হইতে মন-বুদ্ধিকে সংকুচিত করিতেছি... চোখ আমার উন্মীলিত আছে কিন্তু এক অদ্ভুত অনির্বচনীয় স্নিগ্ধ-শীতলতা বোধ করিতেছি... গভীর বিশ্রাম বোধ হইতেছে।

আমি এক অনাদি সত্ত্বা ... এক অতি সূক্ষ্ম আলোক কণা ... সকল জড় তত্ত্ব হইতে ভিন্ন জ্যোতির্ময় সত্ত্বা ... শরীরের সকল শক্তির উৎস-বিন্দু ... এক শাশ্বত জীবনী শক্তি ... এক স্ফুলিঙ্গ ... জীবন জ্যোতি। যেমন যেমন সংকল্প শক্তি একাগ্র হইতেছে ... তেমন তেমন ভারশূন্যতা বোধ করিতেছি ... যেন প্রকাশ ও শক্তির স্রোতে ভাসিতেছি... অবগাহন করিতেছি... এক অব্যক্ত ... এক অলৌকিক শক্তির সঞ্চার বোধ করিতেছি ... ধীরে ধীরে শক্তির পূর্ণতা বোধ হইতেছে ... আমার অনুভব হইতেছে আমার আদি এবং অনাদি স্বরূপ বর্তমান হইতে ভিন্ন।

স্ব ধাম বা আমার ঘর

মন বুদ্ধি সংস্কার সহিত আমি এক আত্মা ... এই শরীর আমার এক কুটীর বিশেষ ... এই কুটীরের মালিক স্বয়ং আমি ... আমি ভ্রূকুটীতে বিরাজমান। আমি এক রথের রথী ... আমি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত ... এই এক স্থান হইতেই সকল কর্ম সম্পাদন করিয়া চলিয়াছি...। আমি কর্তা ও কর্ম ফলের ভোক্তা ... আমি কখনই নির্লেপ নই ...।

আমি এই বৃহৎ সৃষ্টি-রঙ্গ-মঞ্চে অভিনয় করিয়া চলিয়াছি... অপর সকল আত্মাও আমার মতনই অভিনেতা।... শরীর রূপী বস্ত্রের অধিকারী সকলেই আপন আপন অভিনয় করিয়া চলিয়াছে... এখন আমার সামনে আমার অভিনয়ের ভূমিকা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে... পূর্ব জন্মের সংস্কার বা স্মৃতি রেকর্ড (Record) বর্তমানে প্রকট হইতেছে... জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন শরীর রূপী বস্ত্র ... নাম-রূপের বৈচিত্র্যময় সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া অভিনয় করিয়া চলিয়াছি... পুনরায় আসল ঘরে প্রত্যাবর্তন

করিতে হইবে ... নাটক সমাপ্তির পথে ... আমি বুঝিতে পারিতেছি অন্তিম অঙ্কের অন্তিম দৃশ্যে আসিয়া উপনীত হইয়াছি ... বুদ্ধি বল দ্বারা আমি এখন নিজ নিকেতনে ফিরিয়া যাইতেছি ... এই শব্দ জগৎ হইতে দূরে ... অনেক দূরে ... সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র সমন্বিত আকাশ তত্ত্বের পরপারে ... সূক্ষ্ম দেবলোক বা আকারী দুনিয়ারও উপরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি ... আহা! ইহা কি অপূর্ব অনুভব ... নিঃসীম কল্পময় অসীম শান্তির দুনিয়া ... এখানে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এক সোনালী লাল ব্যাপ্ত প্রকাশতত্ত্ব সর্বত্র অনুভব হইতেছে ... ইহাই পরম ধাম ... শান্তিধাম ... মুক্তিধাম ... আমার আপন ঘর।

বুদ্ধি বল দ্বারা এই পবিত্র ঘরে উপস্থিত হইয়াছি ... জন্ম জন্মের সঞ্চিত ক্লান্তির অবসান বোধ করিতেছি ... আমি উন্মুক্ত ভাবে এই জ্যোতির্লোকে বিচরণ করিতেছি বোধ হইতেছে ... আমার স্ব-ধর্মই হইল শান্তি; আমি আত্মা শান্ত স্বরূপ ... সত্য স্বরূপ...চৈতন্য স্বরূপ...আনন্দ স্বরূপ...সুখ স্বরূপ স্নেহ স্বরূপ...করুণা স্বরূপ...দিব্য স্বরূপ...দিব্য গুণ স্বরূপ...এখন আমি আত্মা আমার নিজের প্রকৃত ও অখণ্ড শান্ত স্থিতির অনুভব করিতেছি...।

এইখানে অগণিত আত্মার অবস্থিতি বোধ হইতেছে ... এক বিশেষ জ্যোতি স্বরূপ বিন্দু সকলের উপরে দৃশ্যমান হইতেছে ... তাঁহার প্রকাশ সম্পূর্ণ ভিন্ন ... কেবল তাঁহারই মধ্যে প্রবল আকর্ষণ শক্তি বোধ হইতেছে ... তিনিই সকলের পরমাত্মা ... পরমপিতা ... কল্যাণকারী ত্রিলোকীনাথ পিতা ... সকলের অতি প্রিয় ... আমার আপন প্রিয় শিববাবা।

পরমপিতা পরমাত্মা সম্পর্কে চিন্তন বিধি

আমি আত্মা, পরমাত্মার সন্তান ... যেমন আমি ... আমার পিতা ও সূক্ষ্মজ্যোতিস্বরূপ বিন্দু। রূপে বিন্দু ... কিন্তু সকল গুণের সিন্ধু ... সাগর। তিনিই সকল আত্মার কল্যাণ করিয়া থাকেন ... গুণ বাচক নাম তাঁহার শিব ... আমাদের

নাম সংজ্ঞা বাচক ... তাঁহার নাম কর্তব্য বাচক ... বিশ্বের সকল আত্মার কল্যাণকারী পিতা তিনি ... তিনি সদা সর্ববন্ধন-মুক্ত জন্ম মৃত্যু চক্রের ঊর্ধ্বে ... সুখ দুঃখের ঊর্ধ্বে ত্রিগুণাতীত ... সদা একভাব ও অপরিবর্তনীয়। শিববাবা ... মিঠা বাবা তুমি জ্ঞানের সাগর ... পবিত্রতার সাগর ... শান্তির সাগর ... সুখের সাগর ... প্রেমের সাগর ... আনন্দের সাগর ... সর্বশক্তিমান ... সর্বজ্ঞ ... সকল জ্ঞানের উৎস ... সকল শক্তির উৎস ... সকল গুণের উৎস ... মুক্তি ... জীবন-মুক্তি দাতা ... আমার তাপ-দগ্ধ জীবনের কর্ণধার ...। পতিত পাবন ...। এখন আমি আত্মা ... শান্তিধামে ... অব্যক্ত জ্যোতির দেশে নিজ প্রিয় পিতা শিববাবার মধুর সঙ্গ লাভে সকল গুণের অনুভব করিতেছি ... বোধ হইতেছে আমি আত্মা যেন এক প্রস্রবণের তলদেশে বসিয়া আছি ... সুখ-শান্তি-জ্ঞান-প্রেম পবিত্রতার ধারা আমার উপর পড়িতেছে ... আমি তাহাতে আপ্লুত হইতেছি ... অতীন্দ্রিয় সুখে বিলীন হইতেছি।

শিববাবার সাথে সকল সম্বন্ধ স্থাপনের বিধি

পরমপ্রিয় শিববাবা তুমি কত মহান! উচ্চ হইতেও উচ্চ ... তুমি বীজরূপ জ্যোতিস্বরূপ ... সকল গুণের সাগর ... তুমি ত্রিকালজ্ঞ ... শিববাবা ... প্রিয় পিতা, তুমিই আমার প্রকৃত মাতা পিতা ... আমি আত্মা, তোমার সন্তান ও জ্যোতিস্বরূপ বিন্দুরূপ ... বাবা তুমি আমাকে নিজের সন্তান বানাইয়া ... পরম ভালবাসা ও স্নেহ দ্বারা জন্মজন্মান্তরের ক্লান্তি দূর করিয়া দিয়াছ। অতীন্দ্রিয় সুখ ও আনন্দের অপার সম্পদে ভরপুর করিয়া দিয়াছ ... তোমার সহিত মধুর সম্বন্ধের সংযোগের ফলে ... প্রকাশ শক্তি ও গুণের দিব্য ও সূক্ষ্ম প্রকম্পন আমার উপর আসিয়া পড়িতেছে ... এবং তাহা পুনরায় সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িতেছে ...।

শিববাবা তুমি আমার পরম শিক্ষকও বটে ... মিঠা বাবা ... তুমি আমাকে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দান করিয়া ত্রিনেত্রী বানাইয়া দিয়াছ ...তিন কাল এবং তিন লোকের জ্ঞান দান করিয়া ত্রিকালদর্শী ... ত্রিলোকীনাথ করিয়াছ ... তুমিই আমাকে জ্ঞান দিয়াছ ... সত্য যুগের শুরুতে ভারত পবিত্র ছিল ... এই ভূমিতে শ্রীলক্ষ্মী

শ্রীনারায়ণের রাজ্য ছিল ... সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরপুর ছিল ... অপ্রাপ্ত কিছুই ছিল না ... ইচ্ছা মাত্রম অবিদ্যা ছিল ... প্রকৃতি সেবাধারীরূপে আপন কর্তব্য সম্পাদন করিত ... সুখদান দ্বারা উহা কর্তব্য সম্পাদন করিত ... তখন সমগ্র বিশ্ব একই ভু-খণ্ড ছিল ... ভারত স্বর্গ ছিল ... এখন পুরুষোত্তম সংগমযুগ চলিতেছে ... তুমিই এখন, সাকার সৃষ্টির পিতা, ব্রহ্মা বাবার মাধ্যমে এই অমূল্য জ্ঞান ও যোগের শিক্ষা দিয়া চলিয়াছ ...

বাবা, তুমিই আমার প্রকৃত সদ্‌গুরু ... তুমিই আমাকে মুক্তি ও জীবনমুক্তির রাস্তা দেখাইয়াছ ... তুমিই আমাকে প্রকৃত পথ প্রদর্শন করিয়া চলিয়াছ ... জীবনের অবলম্বন ... জীবনের সার ... তুমিই আমাকে জীবন দান করিয়াছ ... বাবা, তোমার কর্তব্যের মহিমা আমি কীভাবে বর্ণনা করিব ... কীভাবে বাহবা দিব ... তুমিই আমার মনের একমাত্র মিত্র ... বন্ধু ও সখা ... স্বামী ... পতিরও পতি ... পরম হিতৈষী ... কল্যাণকারী ... পাবনকারী তোমার স্মরণের দ্বারাই আমি আত্মা পতিত হইতে পাবন হইব। আমার জীবন ধন্য হইয়াছে ... যাহা কিছু পাইবার ছিল ... তাহা সবই তোমা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে ... তোমার নিকট হইতেই সর্ব সম্বন্ধের স্নেহ-ভালবাসা পাইয়াছি তোমাকে পাইয়া সবকিছু পাইলাম, তোমাকে জানিয়া সবকিছু জানিলাম ... ইহা কতই না সুন্দর অনুভব ... অলৌকিক অনুভব।

শক্তি-স্বরূপ অবস্থার অনুভব

আমি এক শক্তি স্বরূপ আত্মা ... আমি আত্মা দিব্য প্রকাশ স্বরূপ ... মিঠা বাবা ! তুমি সর্বশক্তিমান ...সকল শক্তির দাতা ... আমি তোমার সন্তান ... মাস্টার সর্বশক্তিমান ... কতই না দিব্যতায় পূর্ণ ... কতই না প্রকাশময় ... তোমারই স্মৃতিতে মগ্ন হইয়া সকল শক্তি ... নিজের মধ্যে পূর্ণ করিয়া চলিয়াছি ... আমি প্রকাশ স্বরূপ ... আমি শক্তি স্বরূপ ... আমি আত্মা বীজরূপ ... আমি লাইট-হাউস ... আমি মাইট-হাউস ...

আমি বিশ্বকল্যাণকারী ... তুমি আমাকে বিশ্বকল্যাণের নিমিত্ত বানাইয়াছ ...

সমস্ত বিশ্বে ছড়াইয়া দিবার জন্য তুমি আমাকে দিব্য প্রকাশ ও শক্তিতে পরিপূর্ণ করিতেছ ... আমাকে এই প্রকাশ ও শক্তি সমস্ত বিশ্বে প্রদান করিতে হইবে ...। আমি তাহা দান করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতেছি ... আমি মায়াজিৎ হইয়া চলিয়াছি ... আমি নূতন বিশ্বের ... পবিত্র স্বর্গধামের মালিক হইতে চলিয়াছি ... রূপ আমার জ্যোতির্বিন্দু ... কিন্তু শক্তিতে সূর্য সমান ... আমি লাইট-হাউস, মাইট-হাউস ... এই লাইট ও মাইট দ্বারাই সমগ্র বিশ্ববাসীর কল্যাণ সাধিত হইবে ... প্রকৃতি সত্ত্বপ্রধান হইবে ... এই নরকময় সৃষ্টি স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইবে ...। ওঁ শান্তি।

রাজযোগ সম্পর্কে কতিপয় আবশ্যক কথা

এই রাজযোগ অভ্যাসের জন্য আহার এবং ব্যবহার শুদ্ধ সাত্ত্বিক রাখা তথা সংযম নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে জীবন যাপন করা একান্ত আবশ্যক। এই জন্য নিয়মিতভাবে কোন না কোন সেবাকেন্দ্রে আসিয়া বা সংযোগ রাখিয়া এই অভ্যাসের কৌশল আয়ত্ত করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অধিক লাভবান বা উচ্চতর অবস্থার অধিকারী হওয়া যায়।

এই সহজ রাজযোগ অভ্যাস করিতে হইলে কতকগুলি নিয়ম অবশ্যই পালন করিতে হইবে। এই নিয়ম রাজযোগের চারটি স্তম্ভবিশেষ যাহার উপর উপবেশন করিয়া এই যোগ সাধন করিতে হইবে।

নিম্নে এই চারটি নিয়ম সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল ঃ

ব্রহ্মচর্য — কাম মানুষের পরম শত্রু। কামীমানুষ দেহের উপর আসক্ত হয় এবং বিষয় বাসনায় পূর্ণ হয়, আর তাহার ফলে তাহার মন সর্বদা চঞ্চল হয়। কিন্তু যোগসাধনায় অশরীরী হইয়া আত্মস্থিত না হইলে পরমাত্মার সহিত যোগ সাধনা অসম্ভব। অতএব ব্রহ্মচর্য পালন একান্ত প্রয়োজন।

পবিত্র আহার — কথায় আছে 'যেমন অন্ন তেমন মন'। মন অন্নের দ্বারা প্রভাবিত

হয়। সুতরাং সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে তাহাতে মনে সত্ত্বগুণের সঞ্চার হয়। স্বপাক অথবা যোগ-যুক্ত কোন ব্যক্তি দ্বারা মধুর ঈশ্বরীয় স্মৃতিতে প্রস্তুত নিরামিষ আহারই পবিত্র আহার। ঈশ্বরীয় স্মৃতিতে এইরূপ আহার গ্রহণে মন পবিত্র ও শক্তিশালী হয়।

সৎ-সঙ্গ — প্রতিদিন নিয়মিত জ্ঞান স্নান করা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ ইহা দ্বারা মনের সংশয় দূরীভূত হয় এবং যোগী জীবনে নিত্য নবীন প্রেরণা লাভ করা যায়। যোগরূপ প্রদীপ প্রজ্বলিত করিতে জ্ঞানরূপ ঘৃতের প্রয়োজন। কথায় আছে 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।' সঙ্গই মানুষকে সৎ বা অসৎ পথে চালিত করে। সৎসঙ্গ সৎপথের যাত্রী হইতে অনুপ্রেরণা দেয়। পাঁচ জনকে সৎ হইতে দেখিয়া নিজের মনেও সৎ হইবার বাসনা জাগ্রত হইয়া উঠে। তাহা ছাড়া সৎ বাতাবরণের প্রভাবও মনের মধ্যে সৎভাব আনয়ন করে।

দিব্যগুণ — নিজের জীবনে দিব্যগুণ ধারণ করা, আসুরিক অবগুণ বা লক্ষণ ত্যাগ করাই হইল যোগী জীবনের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। আসুরিক লক্ষণের জন্যই মানুষের জীবন আজ কড়ি-তুল্য হইয়া গিয়াছে। অতএব, বর্তমান জীবনে প্রকৃত ও স্থায়ী শান্তি এবং ভবিষ্যতে সদা সুখী দিব্যজীবন লাভের জন্য যোগাভ্যাসকারীর দিব্যগুণ ধারণের উপর পূর্ণ ধ্যান দেওয়া আবশ্যক। মনের মধ্যে সৎভাব আনয়ন করিয়া পবিত্রতা, জিতেন্দ্রিয়তা, অন্তর্মুখতা, নিঃসংকল্পতা, নির্ভয়তা, সমবস্থা, সাক্ষী, নম্রতা, সরলতা, আত্ম-বিশ্বাস, দৃঢ়তা ইত্যাদি দিব্যগুণের অধিকারী হওয়া যায়।

স্বপন — আপনার যুক্তিযুক্ত ঈশ্বরীয় তথ্যের ব্যাখ্যা শুনিয়া মনের সন্দেহগুলি নিরসন হইয়াছে। এখন বলুন, আপনারা দৈনিক ক্লাসে কী কী এবং কীভাবে তাহা শিক্ষা দিয়া থাকেন?

ব্রহ্মাকুমারী — আমাদের ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি কেন্দ্রে যোগ অনুশীলন এবং জ্ঞান মুরলী পাঠ করিয়া শুনাইবার বন্দোবস্ত আছে। প্রতিদিন সকাল

এবং সন্ধ্যায় এই যোগ অনুশীলন এবং জ্ঞান মুরলী পাঠ করা হয়। সাপ্তাহিক পাঠক্রম সমাপ্ত করিবার পর, যে কেহ এই যোগ অনুশীলন এবং জ্ঞান মুরলী শ্রবণ করিতে পারে।

স্বপন — দিদি, জ্ঞান মুরলী কি, তাহা বিশদ্ বুঝাইয়া বলুন।

ব্রহ্মাকুমারী — মুরলী শব্দের অর্থ বাঁশরী। বাঁশরীর মধুর সুরলহরী মনকে হরণ করিয়া লয়; এমন কি সর্পের ন্যায় হিংস্র প্রাণীও ইহার সুমিষ্ট সুরে মুগ্ধ হইয়া দুলিতে থাকে। ঠিক সেইপ্রকার প্রভাত ও সন্ধ্যায় যখন পরমপিতা পরমাত্মার জ্ঞানের বাণী পাঠ করিয়া গোপ-গোপীদিগকে শোনান হয় তখন তাহারা ইহার মধুর জ্ঞান রসাস্বাদনে এতই বিভোর হইয়া যায় যে তাহারা জ্ঞানের নেশায় মাতোয়ারা হইয়া দুলিতে থাকে; আবার কাহারও মন অন্তর্মুখী নৃত্যে বিভোর হইয়া যায়। সর্প যেমন বাঁশীর সুরে মুগ্ধ হইয়া হিংসা ভুলিয়া আনন্দে দুলিতে থাকে, তেমনই যে কেহ এই জ্ঞান-বাণী শ্রবণ করিয়া কাম ক্রোধাদি পঞ্চ বিকার ভুলিয়া অতীন্দ্রিয়-সুখ অনুভব করিয়া ধন্য হয়। এইজন্য এই জ্ঞানের বাণীগুলিকে মুরলীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কারণ মুরলীর সুরের মতই উহা মধুর এবং চিত্তহরণকারী। কথায় আছে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনিয়া গোপীগণ পাগল হইয়া ছুটিত। কিন্তু তাহাও ঐ জ্ঞান-মুরলী অর্থাৎ জ্ঞানের দিব্য-বাণী যাহা শ্রবণ করিবার জন্য গোপীগণ পাগল হইয়া ছুটিত। সেই অনুপম জ্ঞান-মুরলী প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি কেন্দ্রে চলিতেছে। যে কেহ একবার এই জ্ঞান-মুরলীর মধুর রসাস্বাদন করিয়াছে, সেই জাগতিক দুঃখ-কষ্ট, মান-অপমান, ভয়-ভীতি ইত্যাদি ভুলিয়া দুর্বার গতিতে পুরুষার্থ করিয়া চলিয়াছে; কেন না এই জ্ঞান-মুরলীই তাহাদের জীবনে আনিয়া দিয়াছে অনির্বচনীয় সুখকর পবিত্রতা ও দিব্যতার ঝলক। জ্ঞান মুরলীর তাৎপর্য অনুধাবনে আপনি আগামীকাল নিম্নলিখিত প্রশ্ন সমূহের উত্তর লিখিয়া লইয়া আসিবেন।

প্রশ্ন

১) 'যোগ' কাহাকে বলে। যোগে স্থিত হইবার বিধি কী?

২) যোগে স্থিত হইয়া মনকে একাগ্র করিবার জন্য আপনি কীরূপে মনন চিন্তন করিবেন?

৩) যোগী হইবার চারটির মুখ্য নিয়ম কী কী?

৪) জ্ঞান মুরলীর প্রকৃত তাৎপর্য কী?

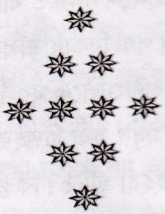

সাপ্তাহিক পাঠক্রম-র সমাপ্তি দিবস

ব্রহ্মাকুমারী — আজ ছয়দিন যাবৎ যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়াছি তাহা নিশ্চয় গভীরভাবে মন্থন করিয়াছেন; কেন না ইতিমধ্যেই আপনার শরীরে একটা দিব্যভাবের অস্পষ্ট ছায়া পরিলক্ষিত হইতেছে। এখন নিশ্চয় আপনার মন পিতাশ্রীর অমৃতময় বাণী শ্রবণ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। অতএব এখন আপনাকে পিতাশ্রীর কতিপয় অমৃতময় বাণী শ্রবণ করাইবার পর যোগের অভ্যাস করাইয়া এই সাপ্তাহিক পাঠক্রম সমাপ্ত করিব।

স্বপন — হ্যাঁ, দিদি, আমি সত্যই হৃদয়ে এক দিব্যভাব অনুভব করিতেছি এবং পিতাশ্রীর অমৃতময় বাণী শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার মন বিশেষ উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে।

ব্রহ্মাকুমারী — এখন আপনি আত্মিক স্থিতিতে স্থিত হইয়া পিতাশ্রীর মধুর বাণী শ্রবণ করুন।

পিতাশ্রীর অমৃতময় বাণী

"আত্মিক সন্তানগণ, তোমাদিগকে বাণীর উপরে আপন ঘরে যাইবার পুরুষার্থ করিতে হইবে। এইজন্য তোমাদিগকে এই পুরাতন জর্জরীভূত দৈহিক সম্পর্ক যুক্ত সমস্ত কিছুই ভুলিতে হইবে।"

"মিঠে বৎস, তোমরা জানিয়া রাখ যে ইহা তোমাদের গৃহে প্রত্যাবর্তন, কেননা সৃষ্টিরূপী নাটক সমাপ্ত হইতে চলিয়াছে। সুতরাং মনকে গৃহাভিমুখী কর"।

"মিঠে বৎস, যাচাই করিয়া দেখ যে নিজের মধ্যে কোন আসুরিক গুণ নাই তো! দৈবী স্বভাব চাই! আপন অবস্থার হিসাব রাখ, দিনে দিনে উন্নত হইতে থাকিবে।"

"প্রিয় বৎস, বিনাশকালে আমার সহিত প্রীতবুদ্ধি রাখিলে বিজয়ী এবং কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।"

"বৎস, জীবন এক নাটক, যাহা কিছু গত হইয়াছে, উহা অভিনয় মাত্র। আমি এই রকম করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু এমন হইল কেন-এইরূপ চিন্তা করিও না।"

"বৎস, যোগ যাত্রায় কিছু জপ করিবার প্রয়োজন নাই! তোমাদের হইতেছে অজপা জপ! মনে মনে পরমাত্মা শিবের সহিত যোগযুক্ত হও।"

"বৎস, শ্যাম সুন্দরের অর্থ তোমারই ভাল জানা। সত্যযুগে তোমরা কত সুন্দর ছিলে এবং দ্বাপর যুগের পরে কত ময়লা (শ্যাম) হইয়া গিয়াছ, এখন আবার যোগ যাত্রার দ্বারা সুন্দর হইতেছ।"

"বৎস, অশরীরী হইবার অভ্যাস করিতে করিতে তোমরা শরীরকে ভুলিতে থাক। অশরীরী যোগ দ্বারাই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হইয়া যাইবে।"

"বৎস, এখন সৃষ্টির অন্তিম সময় এবং সঙ্গম যুগ। এই কল্পান্তের সঙ্গম সময়ে পবিত্র হও। যদি পবিত্র হও, সদ্‌গতি নিশ্চয়ই হইবে। যদি পবিত্র না হও, শাস্তি পাইতে হইবে। পতিত দুনিয়াতে পুরুষার্থ করিয়া সর্বদা পবিত্র থাকিতে হইবে। নিজেকে আত্মা বলিয়া জান এবং অপরকে আত্মা দেখ, অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে ভাই-ভাই দৃষ্টিতে দেখ ইহাতে তোমাদের বিকারী দৃষ্টি (Criminal eye) থাকিবে না। শরীর ছাড়িবার সময় উচ্চ দৃষ্টি হওয়ার ফলস্বরূপ উচ্চপদ প্রাপ্তি করিবে। বৎস, সর্বদা গুণগ্রাহক হইতে হইবে। স্তুতি-নিন্দা, লাভ-হানি, জয়-পরাজয় সর্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া চলিতে হইবে।"

"বৎস, এই রাজ-যোগ দ্বারা তোমরা মহারাজদিগেরও মহারাজ অর্থাৎ সত্যযুগী দৈবী রাজা হইতে চলিয়াছ। যে সমস্ত রাজাদিগের পবিত্রতার মুকুট নাই, উহাদিগকে পতিত রাজা বলা হয়। সত্যযুগী দুই মুকুট বিশিষ্ট (স্বর্ণমুকুট ও প্রভাস মণ্ডল) রাজাকেই পবিত্র দেবতা বলা হয়।"

"মিঠে বৎস, শিব বাবা তোমাদের সকল শাস্ত্রের সার শুনাইতেছেন। লোকে ব্রহ্মার হাতে বেদশাস্ত্র দেখায়। ব্রহ্মা কোথা হইতে আসিল বা তিনি কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করেন শাস্ত্রে উহার কোন বর্ণনা নাই। লোকে ব্রহ্মার হাতে বেদশাস্ত্র দেখায় কিন্তু ইহার অর্থ সম্যক্ জানে না। পরমাত্মা শিব নিরাকার, ব্রহ্মা শরীরধারীর নাম। বহু জন্মের পর অন্তিম জন্মে পরমাত্মা শিব যে 'বৃদ্ধের শরীরে প্রবেশ করিয়া নূতন দৈবী সৃষ্টির কর্তব্য করেন সেই বৃদ্ধের কর্তব্য বাচক নাম প্রজাপিতা ব্রহ্মা। পরমাত্মা শিব সৃষ্টিরূপ বৃক্ষের বীজস্বরূপ। তিনি সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য জানেন।"

"বৎস, তোমরা প্রথমে সত্বপ্রধান দেবতা ছিলে, পরে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইয়া অবশেষে শূদ্রে পরিণত হইয়াছ। এখন আমি তোমাদিগকে পুনরায় শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণ করিতেছি। তোমরা সঙ্গম যুগী প্রকৃত ব্রাহ্মণগণই দেব-পদ প্রাপ্ত করিবে। ইহাই হইতেছে বাস্তবে 'হম সো, সো হম' কথার প্রকৃত তাৎপর্য।'

"বৎস, কল্প-কল্প ধরিয়া প্রতি পাঁচ হাজার বৎসর পর পরমাত্মা শিব ব্রহ্মার এই শরীররূপ রথ দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। সমস্তদিন বুদ্ধিতে রাখ যে শিব বাবা আমাদিগকে ঈশ্বরীয় জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন। পরমাত্মা শিবই আমাদের পরমপিতা পরমশিক্ষক এবং পরম সদ্‌গুরু। তোমাদের জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া পরমাত্মা শিবের কল্প-কল্পের কর্তব্য।"

"বৎস, শারীরিক যাত্রা তো জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া করিয়া আসিতেছ, কিন্তু আত্মিক যোগ যাত্রা কল্পান্তে একবারই করিয়া থাক।"

"বৎস, অন্যান্য ধর্মপিতারা আপন-আপন ধর্ম-মত প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু পরমাত্মা শিব স্বর্গ রাজ্য স্থাপন করেন। বৎস, আমি আসিয়াছি তোমাদিগকে সুখধাম বা স্বর্গ রাজ্য দিবার জন্য। কেবল সুখধাম ও শান্তিধাম চিন্তা কর। এই দুঃখধামকে ভুলিয়া যাও। মুক্তি এবং জীবনমুক্তি তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার।" ...

"মন-বচন-কর্মে কাহাকেও দুঃখ দিও না এবং কাহারও নিকট হইতে দুঃখ নিও না। নিরন্তর আত্মিক পিতা ও ঈশ্বরীয় সম্পদকে স্মরণ কর। তোমাদের সঙ্গমযুগী এই দুর্লভ ব্রাহ্মণ জন্ম হীরাতুল্য। কর্মের গতিকে জানিয়া কর্ম কর।"

"প্রিয় বৎস, পরমাত্মা শিব সকলের পরমপিতা। ভারত সকল দেশের মধ্যে মহান দেশ। আবু সকল তীর্থস্থান হইতে শ্রেষ্ঠ, গীতা জ্ঞান-দাতা কোন সাকার দেহধারী নয়, নিরাকার শিব পরমাত্মা।"

"দিব্যগুণ ধারণ কর, নিরন্তর ঈশ্বরীয় যোগযাত্রায় থাক, পবিত্র হও এবং অপরকে পবিত্র কর।"

এখন কিছুক্ষণের জন্য একাগ্র চিত্ত হইয়া পরমপিতা পরমাত্মা শিবের মধুর স্মৃতিতে মগ্ন হউন।

ওঁ শান্তি

পশ্চিমবঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহের রাজযোগ শিক্ষাকেন্দ্র

১) পূর্বাঞ্চলীয় মুখ্যালয় ঃ ১এ, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২০
ফোন ঃ ২৪৭৫-৩৫২১, ২৪৭৪-৫২৫১

২) কলকাতা ৭০০ ০০৬ ঃ ২৩/৪সি, রায় বাগান স্ট্রীট, ফোন ঃ ২৫৫৫-৭০৭৩/২৫৯১

৩) কলকাতা ৭০০ ০৫৫ ঃ ৮১/১, ব্লক সি, বাঙ্গুর এভিনিউ, ফোন ঃ ২৫৭৪-৭৮৬৩/০৯৫৫

৪) কলকাতা ৭০০ ০৩৪ ঃ ৭৮, ব্রাহ্ম সমাজ রোড, বেহালা, ফোন ঃ ২৪৬৮-৬৬৮৫

৫) কলকাতা ৭০০ ০৫৪ ঃ "জ্ঞান সরোবর ধাম", ২-বি, মোতিলাল বসাক লেন, ফুলবাগান, ফোন ঃ ২৩৫৯-২৫৯১

৬) কলকাতা ৭০০ ০৪৫ ঃ ১৬২ডি/৫৭৯, লেক গার্ডেন্স, স্টেট ব্যাঙ্কের নিকট, ফোন ঃ ৯৪৩৩২ ৯৫৯৬৭

৭) কলকাতা ৭০০ ০৩৬ ঃ ১৭, জি. এল. টি. রোড, বরানগর বাজার, জ্যোতি গারমেন্টসের উপরে , ফোন ঃ ৯১৪৩৬০৫৯৯

৮) কলকাতা ৭০০ ০৫৪ ঃ পি-৫৬, সি.আই.টি. হাউজিং স্কীম - ১২, (৭-এম), নাস্তাগলি, কাঁকুরগাছি, ফোন ঃ ২৩৫৫-৮৬৮৩

৯) কলকাতা ৭০০ ১০৫ ঃ ৯৬ডি, দক্ষিণী কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি, মেট্রোপলিটন

১০) হাওড়া ৭১১ ১০২ ঃ বি১, গ্যাঞ্জেস গার্ডেন্স, ১০৬, কে.সি. সিন্‌হা রোড, শিবপুর, ফোন ঃ ২৬৩৮-৬৫৯৪

১১) কোন্নগর ৭১২ ২৩৫ ঃ ১১০/সি এবং ডি, এস. সি. চ্যাটার্জী স্ট্রীট, হুগলী, ফোন ঃ ২৬৭৪-১২১১

১২) হিন্দমোটর ৭১২ ২৩৩ ঃ ৩৭, সুকান্ত সরণী, মারওয়াড়ী পট্টী, ভদ্রকালী, হুগলী, ফোন ঃ ২৬৯৪-১২৮৭

১৩) চুঁচুড়া ৭১২১০২ ঃ ১১২, প্রিয়নগর (দঃ), পোষ্ট - চুঁচুড়া, হুগলী, ফোন ঃ ২৬৮৬-৫৪৫৬

১৪) শ্যামনগর ৭৪৩ ১২৭ ঃ ১০২, ভরত চন্দ্র রায় পথ, ২৪ পরগণা (উঃ), ফোন ঃ ২৫৮৬-২৮২২

১৫) মালদা ৭৩২ ১০১ ঃ ১০০/২৭৩ ডি., উত্তর বালুচর, জুবিলী রোড, ফোন ঃ ০৩৫১২-২২৩০৫৮

১৬) কৃষ্ণনগর ৭৪১ ১০১ ঃ ৩৮/১, সুকান্ত সরণী, কাঁঠালপোতা, নদীয়া, ফোন ঃ ৯৩৩২৫৮১৪৮১

১৭) বহরমপুর ৭৪২১০১ ঃ ৩৪/২, এস. এন. বাগচি রোড, চুঁয়াপুর, মুর্শিদাবাদ, ফোন ঃ ০৩৪৮২-২২৪৬৯১

১৮) মেদিনীপুর ৭২১ ১০১ ঃ ডি-৩, অরবিন্দ নগর, জজ কোর্ট রোড, ফোন ঃ ০৩২২২-২৬৬৬৮৪

১৯) তমলুক ৭২১ ৬৩৬ ঃ পার্বতীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, ফোন ঃ ০৩২২৮-২৬৭১০৬

২০) কাঁথি ৭২১ ৪০১ ঃ সরস্বতীতলা, পূর্ব মেদিনীপুর, ফোন ঃ ০৩২২০-২৫৮৯০৯

২১) হলদিয়া ৭২১ ৬০৪ ঃ চৈতন্যপুর, খেজুরতলা, পূর্ব মেদিনীপুর, ফোন ঃ ০৩২২৪-২৮৬৮৮২/২৭৩২৬৫

২২) দুর্গাপুর ৭১৩ ২০৪ ঃ কাজী নজরুল ইসলাম রোড, বেনাচিতি রোড, এ জোন, ফোন ঃ ০৩৪৩-২৫৭৪৮২৮

২৩) রানীগঞ্জ ৭১৩ ৩৪৭ ঃ গয়লাবাঁধ, কুমার বাজার, জেলা - বর্ধমান, ফোন ঃ ০৩৪১-২৪৪৯৮৪৮

২৪) আসানসোল ৭১৩ ৩০১ ঃ ২৪০, এস.বি. গড়াই রোড, দুর্গা মন্দিরের কাছে, ফোন ঃ ০৩৪১-২২১৫৭৬১

২৫) বোলপুর ৭৩১ ২০৪ ঃ সি-৭২/৫, কলেজ রোড, স্কুল বাগান, শান্তিনিকেতন, ফোন ঃ ০৩৪৬৩-২৫৪৫৭৭

২৬) বাঁকুড়া ৭২২ ১০১ ঃ "রাজযোগ ভবন", কেরানীবাঁধ, নবপল্লী (রাঠীকল), ফোন ঃ ০৩২৪২-২৫৯৭৫৫

২৭) চিরকুন্ডা ৮২৮ ২০২ ঃ নেহরু রোড, তালডাঙ্গা, জিলা - ধানবাদ, ফোন ঃ ০৬৫৪০-২৭২০৬৪

২৮) বর্ধমান ৭১৩ ১০১ ঃ সাধনপুর রোড, বর্ধমান ভবনের কাছে, ফোন ঃ ০৩৪২-২৬২৫২৭৭

২৯) বনগাঁও ৭৪৩ ২৩৫ ঃ আমলাপাড়া, ২৪ পরগণা (উঃ) ফোন ঃ ০৩২১৫-২৫৭৫২১

৩০) শিলিগুড়ি ৭৩৪ ০০১ ঃ "দিব্যধাম", হিমাচল সরণী, হায়দারপাড়া রোড, ফোন ঃ ০৩৫৩-২৬৪২১৮৬

৩১) দার্জিলিং ৭৩৪ ১০১ ঃ ২০/১, মহাতাব চাঁদ রোড, কুইন্স হিল, ফোন ঃ ০৩৫৪-২২২২৩৫৯

৩২) আলিপুরদুয়ার ৭৩৬ ১২১ ঃ সুভাষ পল্লী, বাস টার্মিনাসের বিপরীতে, ফোন ঃ ০৩৫৬৪-২২৫১২৮৪

৩৩) গ্যাংটক ৭৩৭ ১০৭ ঃ সিকিম, ডেভেলপমেন্ট এরিয়া, ফোন ঃ ০৩৫৯২-২০৪৯০১, ৯৪৩৪০২৪৯০১

৩৪) গুয়াহাটি ৭৮১ ০৩২ ঃ "বিশ্বশান্তি ভবন", ১, বাই লেন, রূপনগর, ফোন ঃ ০৩৬১-২৪৬০২৯৭/৩০০

৩৫) তিনসুকিয়া ৭৮৬ ১২৫ ঃ "ব্রহ্মাণ্ড ভবন", এস.বি.আই. কলোনী, মানব কল্যাণ ট্রাস্ট এর বিপরীতে, ফোন ঃ ২৩৩৯১১৩

৩৬) আগরতলা ৭৯৯ ০০১ ঃ বোধজং গার্লস এইচ.এস. স্কুল, মধ্য বনমালীপুর, ফোন ঃ ০৩৮১-২৩২২৪২২

৩৭) বাংলাদেশ ঃ দ্য এ্যাকাডেমী ফর্ এ বেটার ওর্য়াল্ড, ভোলানন্দ গিরি ট্রাস্ট কমপ্লেক্স
১২, কে. এম. দাস লেন (৪র্থ তল), সেন্ট্রাল ওম্যান্স কলেজের বিপরীতে, টিকাটুলি, ঢাকা - ১২০৩

ওঁ শান্তি ভবন, আবু পর্বত, রাজস্থান

www.brahmakumaris.com